খালিস্তানের পথেই সম্ভব কাশ্মীর সমস্যার সমাধান
পৃঃ - ১৪

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মানুষের পাপে ক্লিষ্টা পতিতপাবনী গঙ্গা
পৃঃ - ১৬

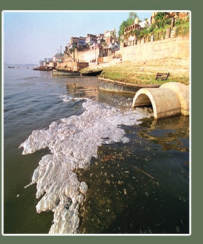

৬৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ২৯ আগস্ট ২০১৬।। ১২ ভাদ্র - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

নমামি গঙ্গে

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

'নমামি গঙ্গে' বিশেষ সংখ্যা
'Namami Gange' Spl. Issue

৬৯ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১২ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৯ আগস্ট - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৮-১১

পাকিস্তান জঙ্গি নাশকতার আঁতুড়ঘর ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১২

খোলা চিঠি : বিদেশ, অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং রেল ছাড়া কেন্দ্রের বাকি সব মন্ত্রক উঠিয়ে দেওয়া উচিত
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১৩

খালিস্তানের পথেই সম্ভব কাশ্মীর সমস্যার সমাধান
▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৪

মানুষের পাপে ক্লিষ্টা পতিতপাবনি গঙ্গা
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৬

গঙ্গা : জাতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উপায়
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৮

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২১

শ্রীকৃষ্ণ ▯ কমলাকান্ত বণিক ▯ ২৩

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন
▯ মেধা শ্রীবাস্তব, যশোস্বিনী মিত্তাল ▯ ২৯

বিচ্ছিন্নতা না স্বাধীনতা ▯ সুদীপ্ত কর ▯ ৩১

আফস্পা যুক্তরাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ ▯ তারক সাহা ▯ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৬-২৭ ▯ **অঙ্গনা : ২৮** ▯ **অন্যরকম : ৩৫** ▯
চিঠিপত্র : ৩৭-৩৮ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৯**
▯ **রঙ্গম : ৪০** ▯ **শব্দরূপ : ৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯
প্রাসঙ্গিকী : ৪৩

৬৯ বর্ষ পদার্পণে স্বস্তিকা'র শুভেচ্ছা

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, লেখক, স্বস্তিকা-র কার্যকর্তা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

— স্বস্তিকা পরিবার

প্রকাশিত হবে
৫ সেপ্টে, '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৫ সেপ্টে, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আদর্শ শিক্ষক ড. রাধাকৃষ্ণন

স্বনামধন্য দর্শনের শিক্ষক ও ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। সেই সূত্রেই এবারের বিশেষ বিষয়— ড. রাধাকৃষ্ণনের জীবনালেখ্য।

লিখেছেন ড. তুষারকান্তি ঘোষ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

সাক্ষী, সিন্ধু-কে অভিনন্দন

ভারতে যখন 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, তখন কোনো পুত্র নয়, দুই কন্যাই ভারতের সম্মান রক্ষা করিয়াছে। ভারত ১১৭ জন খেলোয়াড়ের একটি দলকে রিও-তে পাঠাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সাক্ষী ও সিন্ধু—দুইজনই পদক লইয়া ফিরিয়াছেন। বলিতে দ্বিধা নাই, রিও-তে ভারত যে সামান্য সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহা এই মহিলা প্রতিযোগীদের কারণেই। তাঁহারা যে শুধু নৈপুণ্য নয়, বিশেষত সাক্ষী যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, যে সমাজ-পরিবেশের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রশংসার দাবি রাখে। ফ্রি-স্টাইল কুস্তিতে ব্রোঞ্জ পদক জিতিয়াছেন সাক্ষী মালিক। অলিম্পিকে যাওয়ার আগে অদম্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলিয়াছিলেন—'জিতেই ফিরব।' তাহাই তিনি করিয়া দেখাইয়াছেন। মহিলাদের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টনে পিভি সিন্ধু রৌপ্য পদক লাভ করিয়াছেন। বিশ্বের এক নম্বর র‍্যাঙ্কিং-য়ে থাকা স্পেনের ক্যারোলিনা মার্টিনের সঙ্গে ১০৯ নম্বর র‍্যাঙ্কিং ভারতের সিন্ধু কতটা লড়িতে পারিবেন, তাহা লইয়া আশঙ্কা ছিল। শেষ পর্যন্ত সিন্ধু সব অভিজ্ঞতা উজাড় করিয়া দিয়াও পরাজিত হইয়াছেন। হারিলেন, কিন্তু লড়িয়া হারিলেন। আরও এক উজ্জ্বল তারকা দীপা কর্মকারকে লইয়া অনেক প্রত্যাশা ছিল। জিমনাস্টিকের ভল্ট-ইভেন্টে বিশ্বকাপে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র ০.১৫০ পয়েন্টের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বিশ্ব স্তরের প্রতিযোগিতায় ভারতের নারীরা কোনো সময়েই ততটা পিছাইয়া ছিলেন না। কর্ণম মালেশ্বরী প্রথম ভারতীয় নারী যিনি মহিলা ভারোত্তোলনে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। মুষ্টিযুদ্ধে মেরি কম এবং ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেহওয়াল ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে নিজেদের নৈপুণ্য দেখাইয়া ভারতের নাম বিশ্ব ক্রীড়ামহলে উজ্জ্বল করিয়াছেন। সিন্ধু ও সাক্ষী সেই ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

তাঁহাদের এই কৃতিত্বে সারা দেশে যে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে তাহা বজায় রাখা দরকার। কেননা ইহার ফলে অল্পবয়স্ক খেলোয়াড়রা আরও আগাইয়া যাইবার প্রেরণা লাভ করিবে। এইসব খেলোয়াড়রা যত বেশি সংখ্যায় আগাইয়া আসিয়া নিজেদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রকাশ করিবেন ততই দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ। কেননা অলিম্পিকে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন দেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগই একটা মর্যাদার বিষয়। এই প্রসঙ্গে সাক্ষী, সিন্ধু, দীপাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রশিক্ষকদেরও প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

এই কথা ঠিক, লন্ডন অলিম্পিকের তুলনায় রিও অলিম্পিকের ফলাফল উজ্জ্বল নয়। আমাদের দেশের খেলার পরিকাঠামো কীরকম তাহা আমাদের কমবেশি জানা। তাই বিশ্বস্তরে আয়োজিত কোনো ক্রীড়া অনুষ্ঠানে পাঠাইবার আগে খেলোয়াড়দের, তাহাদের প্রশিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সুবিধা ও উপযুক্ত সরঞ্জাম জোগাইবার কথা চিন্তা করিতে হইবে। আর এই কাজে কোনোরকম ফাঁকি চলিবে না। নিরন্তর কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কেননা ইহা সাধনারই নামান্তর। ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জবাবদিহির বিষয়টিও নিশ্চিত করিতে হইবে। এই বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ক্রীড়া সংগঠনগুলির গতিবিধির উপর তাহারাই নজরদারি করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে অদক্ষ নিকম্মা দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রকে নির্মূল করিতে হইবে। সাক্ষী, সিন্ধুর সাফল্যে এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না বিশ্বের ক্রীড়া জগতে মর্যাদার আসন গ্রহণ করিতে হইলে কোন স্তরে কী করা প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ।
নাস্ত্যদ্যমসমো বন্ধুঃ কৃত্বা যং নাবসীদতি।। (চাণক্য নীতি)

মানুষের শরীরে অবস্থিত আলস্যই সবচেয়ে বড় শত্রু। পরিশ্রমের মতো দ্বিতীয় কোনো বন্ধু নেই, কেননা পরিশ্রমী ব্যক্তি কখনো আলস্যগ্রস্ত হন না।

বীর চুড়কা মুর্মু বলিদান স্মরণ দিবসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''মানুষ তিন জায়গা থেকে সংস্কার পায়। প্রথমত, তার মায়ের কাছ থেকে, দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় থেকে এবং তৃতীয়ত, সঙ্ঘের শাখা থেকে। শাখার মাধ্যমেই একজন মানুষ পূর্ণতা পায়। বীর চুড়কা মুর্মু তার জীবন দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছেন।'' গত ১৮ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চকরাম প্রসাদ গ্রামে বীর চুড়কা মুর্মুর বলিদান দিবসে এসে আবেগাপ্লুত হয়ে একথা জানান ভারত সরকারের পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স ও কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এস. এস. আলুওয়ালিয়া। আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এসে তিনি চুড়কা মুর্মুর শহীদ বেদীতে পুষ্পার্পণ ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। বীর চুড়কা মুর্মুর জীবনী কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি করার আশ্বাসও প্রদান করেন তিনি। মন্ত্রীর পাশাপাশি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ ড. তিলক রঞ্জন বেরা, অখিল ভারতীয়-সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো-সহ সঙ্ঘের অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সারাদিন ব্যাপী কাবাডি, তীরন্দাজি

চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলুওয়ালিয়া ছাত্রীবৃত্তি প্রদান করছেন। পাশে অঃ ভাঃ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত ও প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার।

প্রতিযোগিতা চলে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

চুয়াল্লিশ বছর আগে পাকিস্তানের সেনার আক্রমণ থেকে দেশমাতৃকাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল যুবক চুড়কা মুর্মু। ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট খানসেনাদের আক্রমণে বালুরঘাট শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরের গ্রাম চকরাম প্রসাদের বাসিন্দারা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় মাত্র চার জন বিএসএফ জওয়ানের সঙ্গে কুড়ি বছর বয়সী শাখার মুখ্যশিক্ষক চুড়কা মুর্মু খানসেনাদের রুখে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল। দেশের সীমানা রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু বলিদানের এত বছর কেটে গেলেও বনবাসী ওই যুবকের স্মৃতি রক্ষার্থে রাজ্য বা কেন্দ্র কোনো সরকারের পক্ষ থেকেই বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এবছরই প্রথম ভারত সরকারের পার্লামেনটারি অ্যাফেয়ার্স ও কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এস. এস. আলুওয়ালিয়া বীর চুড়কার গ্রামে আসেন। মন্ত্রী নিজে গ্রামের উন্নতি ও চুড়কার পরিবারকে সাহায্য ছাড়াও গ্রামের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিবছরই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ১৮ ও ১৯ আগস্ট চুড়কা মুর্মু স্মৃতি রক্ষা কমিটির নামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ ড. তিলক রঞ্জন বেরা জানান, দীর্ঘদিন থেকেই তাঁর এই গ্রামে আসার ও দর্শন করার ইচ্ছে ছিল। আজ তা পূর্ণ হলো। এই স্থান পুণ্য স্থান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও একান্ন পীঠের মতো এই স্থানও সকলের কাছে পুণ্যভূমি। চকরাম প্রসাদ গ্রাম শহিদের রক্তমাখা। সবারই এই স্থানের ধুলো মাটি মাথায় নেওয়া উচিত। মায়েদের কাছে ড. বেরা আবেদন জানান যে, তারা যেন প্রতি মাসেই তাঁদের ছেলে মেয়েদের কাছে চুড়কার কথা বলেন। যাতে করে আগামী প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত জানান, চুড়কা মুর্মুকে যুব সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। চুড়কা মুর্মু আদর্শ, দেশাত্মবোধ, নির্ভীকতা দিয়ে দেশকে রক্ষা করেছে। বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে এই ধরনের আদর্শ তুলে ধরতে পারলে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাক, চীনের দখল করা কাশ্মীর ছিনিয়ে আনতে হবে : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীরের যে অঞ্চল পাকিস্তান এবং চীনের দখলে রয়েছে ভারতের এখনই তা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত।

সম্প্রতি আগ্রার একটি সমাবেশে ভাষণ দেবার সময় শ্রীভাগবত বলেন, সরকার যে শীগগির এই সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে এবং কাশ্মীরের অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে সে ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। তিনি আরও বলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই মর্মে সংসদ দু'বার বিবৃতিও দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টি এখনও ঝুলে রয়েছে। সরকার শীগগির গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্রমশ তাদের শেকড় হারাচ্ছে। তিনি বলেন, 'তবুও একটা আতঙ্ক এখনও উপত্যকায় রয়ে গেছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে একযোগে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে।' কাশ্মীর ইস্যুকে জাতীয় ইস্যু আখ্যা দিয়ে তিনি দেশবাসীকে এর জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

সীমান্তের সুরক্ষায় ভারতের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সীমান্তে চীনের সমরসজ্জার পাল্টা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ভারত প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এই প্রস্তুতির কৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে লাদাখ, উত্তরপূর্বাঞ্চল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাড়তি সুখোই ৩০ এম কে আই যুদ্ধবিমান, স্পাইড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র সম্ভারে মুড়ে ফেলা হচ্ছে উত্তরপূর্বাঞ্চল। সেইসঙ্গে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকেও। আবার পূর্ব লাদাখে মোতায়েন করা হচ্ছে ট্যাঙ্কবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী দুই দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় অসামঞ্জস্য দূর করতে ভারত অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলায় একটি আপৎকালীন অবতরণ ক্ষেত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে বিমান এবং হেলিকপ্টার দুইই ওঠানামা করতে

পাশিঘাট ল্যান্ডস্ট্রিপ থেকে উড়ছে সুখোই-৩০ এম কে আই যুদ্ধবিমান।

পারবে। এ ব্যাপারে এক প্রতিরক্ষা আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এখান থেকে শত্রুকে আমরা দ্রুত প্রত্যাঘাত করতে পারব। গোটা পূর্ব সীমান্তে আমাদের সাফল্যের হার বেড়ে যাবে।' সিয়াং ছাড়া অরুণাচলেরই পাশিঘাট এবং লাদাখের নিওমায় একই ধরনের অবতরণ ক্ষেত্র বানিয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনী। সূত্রের খবর অনুযায়ী তুতিং এবং তাওয়াঙে আরও দুটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র তৈরি করার কাজ চলছে যা যথাক্রমে ৩১ ডিসেম্বর এবং ৩০ এপ্রিল নাগাদ শেষ হবে। গত ১৯ আগস্ট এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজু এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর ইস্টার্ন কম্যান্ডের প্রধান সি হরিকুমার। যুদ্ধবিমানের সঙ্গে সঙ্গে মালবাহী বিমানও পাশিঘাটের অবতরণ স্থলটিকে ব্যবহার করতে পারবে। চীনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ-রেখা বরাবর ভারতের পাঁচটি আধুনিক অবতরণ স্থল থাকলেও পাশিঘাটের গুরুত্ব আলাদা। যেহেতু এখানে মূলত ভারতীয় যুদ্ধবিমানগুলিকেই অবতরণের ব্যবস্থা করানো হচ্ছে। সূত্রের খবর, মালবাহী বিমান সি ১৭ কিংবা আই এল ৭৬ থেকে মাঝারি মানের মালবাহী বিমান সি ১৩০ জে বা এএন ৩২— এই অবতরণ স্থলটি সমস্ত পণ্যবাহী বিমানেরই উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণেরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিগত কয়েক বছরে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন সড়কপথেও পাশিঘাট বিমানঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজতর হবে যেহেতু গুয়াহাটি, লখিমপুর ও ইটানগরের সঙ্গে এর সংযোগ বেশ ভালো। পাশিঘাট থেকে মাত্র ৩৮ কিমি দূরত্বে রয়েছে রাঙ্গিয়া-মুরকংসেলেক ব্রড গেজ ট্র্যাকের মুরকংসেলেক টার্মিনাল রেল স্টেশন। শোনা যাচ্ছে রেললাইন পাশিঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আন্দামান এবং নিকোবর কম্যান্ডের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। ভারতীয় সেনা ইতিমধ্যেই কম্যান্ডের অধীনে সুখোই হারকিউলিস যুদ্ধবিমান-সহ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র রাখতে শুরু করেছে। ভারত মহাসাগরে চীনের আগ্রাসন ঠেকাতে আন্দামানকে কৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে ভারতীয় সেনা।

সাধারণ কাশ্মীরিদের হাত দিয়েই টাকা যাচ্ছে জঙ্গিদের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এন আই এ তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিদেশ থেকে কাশ্মীরকে অশান্ত করতে জঙ্গিদের হাতে যে টাকাপয়সা আসছে তাতে ব্যবহার করা হচ্ছে সাধারণ কাশ্মীরিদের। এন আই এ তদন্তে দেখা গিয়েছে এতে গালফভুক্ত দেশগুলিতে যে সমস্ত কাশ্মীরিরা কাজ করতে গিয়েছেন তাদেরই মূলত টার্গেট করা হচ্ছে। কীভাবে? প্রথমেই এদের মগজধোলাই করা হয়। এরপর এদের ভারতীয় অ্যাকাউন্টে হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করে দেওয়া হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নজর এড়াতে ১ লক্ষের বেশি টাকা কখনোই এদের অ্যাকাউন্টে আসছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে বিদেশ থেকে দশলক্ষের বেশি টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকলে সেটি 'সাসপিসিয়াশ ট্রানজাকশন রিপোর্ট'-এর আওতাভুক্ত হবে এবং তাতে নিয়মিত নজরদারি চলবে। স্বাভাবিকভাবেই গালফ দেশগুলিতে কাজে যাওয়া কাশ্মীরিদের অ্যাকাউন্টে তাদের মাইনে বাবদ টাকা প্রতি মাসেই আসে। মাঝে মধ্যে উপরি টাকা পেলেও সেটা তাদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। সুতরাং বিদেশে কাশ্মীরি জঙ্গিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্নরা এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের আয়কর দপ্তরের নজর এড়িয়ে এদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢেলে দিতে পারছে। ফলে আয়কর দপ্তরের কোনো সন্দেহও হচ্ছে না।

গোয়েন্দারা লক্ষ্য করে দেখেছেন কাশ্মীরি যুবকদের অ্যাকাউন্টে টাকা আসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তা তুলে নেওয়া হচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য গালফ দেশে কাজের খোঁজে যাওয়া কাশ্মীরি যুবকরা 'কমিশন' বাবদ তাদের অ্যাকাউন্টে আসা মোট অর্থের এক শতাংশ করে পাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, গোয়েন্দারা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একপ্রকার নিশ্চিতই ছিলেন যে কাশ্মীরকে অশান্ত করতে জঙ্গিপনার পেছনে বিদেশি অর্থের মদত ছিল।

ভারতে জলপথ পরিবহণের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের জলপথ পরিবহণের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করে বারাণসী থেকে গত সপ্তাহে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটির জলযানে চেপে গার্ডেনরিচের ২নং জেটিতে এসে পৌঁছল মারুতি কোম্পানির ২৪টি গাড়ি। এই পরীক্ষামূলক পরিবহণের সাফল্যে উজ্জীবিত কেন্দ্রের নীতিন গড়করির অধীনস্থ পরিবহণ, হাইওয়ে ও জাহাজ দপ্তর। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত এই প্রকল্পের সাফল্যের ফলে দেশের জলপথ পরিবহণে বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছে। এর ফলে পরিবহণ খরচই যে শুধুমাত্র কমবে তা নয়, একই সঙ্গে স্থলপথের ওপর চাপও অনেকটাই লাঘব হবে। হাইওয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা এমনই অত্যন্ত চাপের মুখে।

প্রসঙ্গত, এম ভি ভি ডি গিরি নামে আই ডব্লুউ টি এ-র এই জলযানটি মাত্র ৬ দিনে বারাণসী থেকে কলকাতার যাত্রাপথ সম্পূর্ণ করেছে। এই মর্মে গড়করি বলেন, কেন্দ্রের সংস্থা আই ডব্লুউটিএ নিজস্ব গোডাউনে মারুতি গাড়ি রাখার সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ৭ দিন পর্যন্ত বিনা খরচায় এই সুবিধে দেওয়া হবে যাতে ডিলাররা সরাসরি এখান থেকেই গাড়ি তুলে নিতে পারেন। পৃথিবীর মধ্যে নদীপথে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবহণ নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ ব্যবহার হয়নি। এন ডব্লুউ আই নামের ১৬২০ কিমি দূরত্বের গঙ্গার এলাহাবাদ-হলদিয়া নদীপথ এখন গমগম করছে।

বিশেষ করে কয়লা, সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ ইত্যাদি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আবশ্যকীয় পণ্যই সর্বপেক্ষা বেশি এই নদীপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে প্রকাশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে জলপথ পরিবহণ এমনই নির্ঝঞ্ঝাট একটি বিকল্প পরিবহণ যে নতুন নতুন ব্যবসায়িক সংস্থা এই সুবিধে নিতে উদগ্রীব। পরীক্ষামূলক পরিবহণে ২৪টি গাড়ি পাঠানো হলেও ২০০ গাড়ি বহন করার পরিকাঠামো আই ডব্লুউ টি এ প্রস্তুত করে রেখেছে বলে জানা গেছে। বিখ্যাত Hyundai গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা ইতিমধ্যে তাদের গাড়ি পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করেছে।

ব্যবসায়িক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো স্থলপথে গাড়ি পিছু পরিবহণ খরচ যেখানে ১৫ হাজার টাকা, সেখানে জলপথে তা নেমে আসছে ৮ হাজার টাকায়। গাড়ির সংখ্যা এক লপ্তে যত বাড়বে পরিবহণ খরচ আরও কমবে বলে জানা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার অধিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মোদী সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল। পাকিস্তান আফগানিস্থান বাংলাদেশের যে সব হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান শিখ পারসি শরণার্থী ভারতে বসবাস করছেন তারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হলে সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড বা আধার কার্ডের জন্য আবেদনও করতে পারবেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির যেসব শরণার্থী দীর্ঘমেয়াদি ভিসার ভিত্তিতে ভারতে বসবাস করছেন তাদের সামনে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়ে মোদী সরকার জাতীয় নাগরিকত্ব আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনীর কাজ এগিয়ে রাখল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী বিলটি কিছুদিন আগে ভারতীয় জনতা দল নেতা ভর্তৃহরি মহতাবের আপত্তি মেনে সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কমিটি তার সুপারিশ দাখিল করবে। সরকারি সূত্র থেকে জানা গেছে, যেসব হিন্দু শিখ বৌদ্ধ জৈন পারসি এবং খৃস্টান শরণার্থী দীর্ঘমেয়াদি ভিসার ভিত্তিতে ভারতে বসবাস করছেন তারা এখন থেকে স্বত্বত্যাগপত্রের পরিবর্তে এফিডেভিট দাখিল করতে পারবেন। দু' বছরের পরিবর্তে তাদের পাঁচ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ভিসা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও মিলবে।

শরণার্থী পরিবারের শিশু এবং যুবক-যুবতীরা পাবেন বিদেশি কোটায় স্কুলে এবং কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ। এর জন্য আলাদা করে রাজ্য সরকারের অনুমতি লাগবে না। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বিশেষ ক্ষমতাবলে শরণার্থীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নিয়োগ করতে পারবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্যান কার্ড, আধারকার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবার পর পরিচয় নিয়ে শরণার্থীদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না। তাঁরা ইচ্ছে করলে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারবেন এবং ভারতের যে-কোনো জায়গায় অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারবেন।

শরণার্থীদের আরও একগুচ্ছ সুবিধা দেওয়ার কথা ভেবেছে সরকার। তারা ভারতের যে-কোনো জায়গায় যেতে পারবেন। দীর্ঘমেয়াদি ভিসা সংক্রান্ত কাগজপত্র এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যেতে কোনো বাধা থাকবে না। পেনাল্টির পরিমাণ ৩০ ডলার ১০০ ডলার এবং ২৩০ ডলার থেকে কমিয়ে যথাক্রমে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা করা হয়েছে। বাসস্থান বদলে অন্য কোথাও গেলে নতুন ঠিকানা থেকে পুনরায় ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে।

এক বালুচ বোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে করলেন 'রাখিভাই'

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাকঅধিকৃত কাশ্মীর ও বালুচিস্তানের নাগরিকদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দমনপীড়নের কথা বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য সেখানকার নেতৃস্থানীয়রা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হলো, গত ১৯ আগস্ট রাখিপূর্ণিমার দিন বালুচিস্তানের বালুচ স্টুডেন্টস অর্গানাইজেসনের প্রধান নেত্রী করিমা বালুচ এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'ভাই' হিসেবে স্বীকার করেছেন। বার্তায় তিনি বালুচিস্তানে পাকিস্তানের নরসংহার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে অবগত করানোর আবেদন জানিয়েছেন।

রাখিবন্ধন উপলক্ষে করিমা বলেন, পাকিস্তানি সেনারা শত শত বালুচভাইকে অপহরণ করছে, গ্রেপ্তার করেছে ও প্রাণে মেরে দিয়েছে। শত শত বালুচ বোন তাদের ভাইদের ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছে, কিন্তু ফিরে আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

করিমা বলেন, বালুচরা নিজেদের যুদ্ধ নিজেরাই লড়বে, 'রাখিভাই' মোদী যেন বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেন। শেষে তিনি গুজরাটি ভাষায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উবাচ

"আনন্দ শর্মার মতো আজকের কংগ্রেসের নেতারা প্রথমে বলুন, এটা সেই একই কংগ্রেস কিনা যার নেতৃত্ব করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল এবং পণ্ডিত নেহরুর মতো মানুষরা।"

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

১৯৫০-এর পর কংগ্রেস থেকে বিজেপি বেশি কষ্ট পেয়েছে—প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে।

"রুপোর পদক নিয়ে শেষ করেছি, কিন্তু সত্যিই আমি খুশি। সোনার পদক জিততে পারিনি, কিন্তু খুব চেষ্টা করেছি। এটা যে কারোর পক্ষে হতে পারে।"

পিভি সিন্ধু
রিও অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে রৌপ্য পদকজয়ী

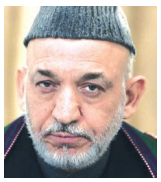

"ভারতের সহযোগিতা এবং আফগানিস্তান ও সংশ্লিষ্ট এলাকার বিষয়ে দৃঢ় অবস্থানের জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

এক সাক্ষাৎকারে।

হামিদ কারজাই
আফগানিস্তানের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট

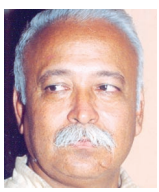

"এ দেশে এমন কোনো আইন নেই যা হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিজেদের পারিবারিক অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের কথা মনে রেখে এবিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।"

আগ্রায় শিক্ষকদের সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে।

মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক, আর এস এস

"যারা পাথর ছুঁড়ছে তারা ভারত আক্রমণকারী পাকিস্তানের দালাল। নতুন ধরনের এই আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তান ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতিকে ধ্বংস করতে চায়।"

শ্রীনগরে বিজেপি তেরঙ্গা যাত্রার এক সমাবেশে।

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

পাকিস্তান জঙ্গি নাশকতার আঁতুড়ঘর

কাশ্মীর উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান এবার সরাসরি সেখানে সেনা পাঠানোর হুমকি দিয়েছে। এতকাল পাকিস্তান কাশ্মীরে রক্তক্ষয়ী ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছিল। এবার পাক সেনাপ্রধান জেনারেল রাহিল শরিফ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কাশ্মীরের মুসলমানদের 'আজাদির লড়াইতে' প্রয়োজনে পাকিস্তান সামরিক হস্তক্ষেপ করবে। অর্থাৎ, কাশ্মীর দখলের জন্য পাকিস্তান চতুর্থবার ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। অতীতে পাকিস্তান কাশ্মীর দখলের জন্য ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ২০০০ সালে যুদ্ধ করেছে। তিনবারই ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালায়। তবু পাক যুদ্ধবাজ সেনাপ্রধানের 'লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর' স্লোগানে কোনো ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। পাক মদতে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যেভাবে ঘোরালো হয়ে উঠছে তাতে উন্মাদ পাক যুদ্ধবাজরা সত্যি সত্যি হামলা চালাতে পারে।

পাক জেনারেল রাহিল শরিফ ভারতকে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তার পিছনে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের উস্কানি আছে। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে নওয়াজ শরিফ নিন্দা প্রস্তাব এনেছিলেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীর উপত্যকায় নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে। দাবি করা হয়েছে, জেনিভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি দলকে অবিলম্বে কাশ্মীরে গিয়ে সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলি সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে। যদি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তবে কাশ্মীরিদের আজাদির লড়াইতে পাকিস্তান সব রকম সাহায্য করবে। প্রস্তাবে ২০ জুলাই সারা পাকিস্তানে 'কালা দিবস' পালনের আহ্বান জানানো হয়। পার্লামেন্টে পাক প্রধানমন্ত্রীর পেশ করা নিন্দাপ্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ হওয়ার পরেই রাওয়ালপিন্ডিতে পাক সেনাপ্রধানদের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকের পরেই পাক জেনারেল রাহিল শরিফ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা সেখানকার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের হুমকিকে ফাঁকা আওয়াজ বলে উড়িয়ে দেওয়াটা ভুল হবে। সম্প্রতি ইসলামাবাদে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির

গূঢ় পুরুষের

কলম

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক কার্যত ভণ্ডুল হয়ে যায় পাক-ভারত বাগ্‌যুদ্ধের ফলে। পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধরি নিসার আলি বৈঠকে উপস্থিত রাজনাথ সিংকে লক্ষ্য করে জানতে চান যে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার সন্ত্রাস বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? জবাবে রাজনাথ সিং বলেন, কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানের নাক গলানো ভারত বরদাস্ত করবে না।

পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাল্টা বলেন, কাশ্মীরের মুসলমানের আজাদির লড়াই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা কাটাকাটিতে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে যে রাজনাথ সিং পাক সরকারের দেওয়া মধ্যাহ্নভোজ বয়কট করে দেশে ফিরে আসেন। ফলে নভেম্বরে ইসলামাবাদে নির্ধারিত সার্ক বৈঠক এখন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় সাম্প্রতিক হাঙ্গামাকে গণ-আন্দোলন বলা যায় না। এই হাঙ্গামার সঙ্গে উপত্যকার কিছু উগ্রবাদী সুন্নি মুসলমান যুবক সক্রিয়ভাবে যুক্ত। জম্মু এবং লাদাখ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হননি। তাই এই আন্দোলনকে সমগ্র কাশ্মীরের মানুষের আজাদির লড়াই বলে বিভ্রান্ত করার পাক কৌশল মানা যায় না। পাক মদতেই যে উপত্যকার আন্দোলন চলছে তার প্রমাণ শ্রীনগরের নাউহাট্টাতে সম্প্রতি জঙ্গি হামলায় সি আর পি এফের একজন কম্যান্ডার নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আটজন জওয়ান। গুলির লড়াইতে নিহত দু'জন জঙ্গি পাকিস্তানের নাগরিক বলে চিহ্নিত হয়েছে। তারা ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে শ্রীনগরে হামলা চালাতে পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ করেছিল। মনে রাখতে হবে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের অন্যতম কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কাশ্মীর উপত্যকায় হাঙ্গামা ছড়িয়েছে। সেই জঙ্গি নেতাকে পাকিস্তান সরকারিভাবে শহিদের মর্যাদা দিয়েছে। তাই পাকিস্তানের কাশ্মীর দখলের পরিকল্পনাকে উড়িয়ে দিতে পারছি না।

আনন্দের কথা যে, ভারতের এই সঙ্কটে প্রকৃত বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়িয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সে দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু দিল্লীতে বলেছেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা দিবসে যা বলেছেন ব্যাপারটা ঠিক তাই। পাকিস্তান সর্বত্র মৌলবাদ ও জঙ্গি নাশকতাকে সহায়তা করে চলেছে।' তিনি বলেছেন, জামাত পাকিস্তানের মৌলবাদী জঙ্গিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারত ও বাংলাদেশে নাশকতা চালাচ্ছে। ইসলামের নামে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য ভারতের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভবিষ্যতে ভারত বিরোধী পাক অপপ্রচারের জবাবও দুই দেশ যুক্তভাবেই দেবে। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে যে সমস্ত জঙ্গি হামলা এবং নাশকতার ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সব কটিতেই হামলাকারীদের সঙ্গে পাক মদতপুষ্ট জামাত-ই-ইসলামির যোগ পাওয়া গিয়েছে। সন্দেহ নেই এই উপমহাদেশে পাকিস্তান জঙ্গি নাশকতার আঁতুড়ঘর।■

বিদেশ, অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং রেল ছাড়া কেন্দ্রের বাকি সব মন্ত্রক উঠিয়ে দেওয়া উচিত

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
৭, রেসকোর্স রোড, নয়াদিল্লী

মাননীয় মোদীজী,

আপনাকে আমি বিশেষ চিঠি লিখি না। কিন্তু এবার লিখতেই হচ্ছে। কারণ, আমার দিদির প্রস্তাব আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকারের চারটি বিষয় দিদি হ্যান্ডেল করতে পারবেন না, কিন্তু বাকিগুলি পারবেন। তাই আপনি দয়া করে একটু চেষ্টা করুন যাতে বিদেশ, অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং রেল ছাড়া কেন্দ্রের বাকি সব মন্ত্রক উঠিয়ে দেওয়া যায়।

দিদি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে একটু সমস্যায় আছেন। দিদি তাঁর ভাইদের বাগে আনতে পারছেন না। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তার পরে লোকসভা ভোট। দলে টাকা দরকার কিন্তু সিন্ডিকেট নিয়ে যে হারে রক্তপাত হচ্ছে সেটাও মেনে নেওয়া যায় না। বাজার থেকে প্রচুর টাকা দেনা করে ফেলেছেন দিদি। সরকার চালাতে গেলে মেলা করতে হয়। মেলা না করলে দলের কোষাগার ভরে না। এদিকে টাকা নেই। তাই ধার করেই মেলা চলছে। এর উপরে বাম আমলের ঋণ তো আছেই। সব মিলিয়ে দিদি একটু নাজেহাল। কেন্দ্রের বিরোধিতা করার জন্য ইস্যু নেই। এদিকে টাকার অভাবে মাথা ঠিক রাখা যাচ্ছে না। তাই কিছু না পেয়ে নরেন্দ্র মোদীজী আপনার বিরুদ্ধেই সুর সপ্তমে চড়িয়েছেন আমার দিদি মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঠারেঠোরে বুঝিয়ে আসছিলেন, এখন থেকে কেন্দ্র বিরোধী অবস্থান নিয়েই চলবেন তিনি। সম্প্রতি সাংবাদিক বৈঠক করে আপনার সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধই ঘোষণা করে দিলেন তিনি। বিদেশ, অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং রেল ছাড়া কেন্দ্রের বাকি সব মন্ত্রক তুলে দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি এখন যা চলছে সেটা 'জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর'!

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, মোদী সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত মানবে না রাজ্য। দিদির অভিযোগ, রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করছে কেন্দ্র। তিনি বলেছেন, ''রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠিয়ে এর প্রতিবাদ জানাব। সংবিধান অনুযায়ী এসব ঠিক হচ্ছে কি না, তা তাঁর কাছে জানতে চাইব। বিদেশ, অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং রেল ছাড়া কেন্দ্রের বাকি সব মন্ত্রক উঠিয়ে দেওয়া উচিত।'' প্রধানমন্ত্রীজী আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সম্প্রতি রাজ্যগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে সামাজিক প্রকল্প সম্পর্কে একগুচ্ছ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। সেখানে করণীয় নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের আর্থিক দায়ভার বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের মাথাব্যথার কারণ আরও বড়। কেন্দ্র জানিয়েছে, এখন থেকে 'পাবলিক ফাইনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে'র মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক কর্মকাণ্ডের উপর 'নজর' রাখা হবে। পাশাপাশি, কেন্দ্রের একজন করে অফিসার বিডিও স্তরে কিছুদিন করে কাজ করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''কোঅপারেটিভ ফেডারালিজম নামটি সামনে রেখে একনায়কতন্ত্র চলছে। ট্রেজারিতে কেন্দ্রের পাঠানো লোক নজরদারি চালালে রাজ্য সরকারের থাকার দরকার কী! যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধূলিসাৎ করছে। নরেন্দ্র মোদীর আমলে পরাধীন হয়ে গেলাম!'' ঠিক কথাই তো। দিল্লী এত নজরদারি চালালে কেন্দ্রের প্রকল্প রাজ্যের বলে চালানো যাবে কী করে! একটু টাকাপয়সা নয়ছয় না করতে পারলে দিদির দল কী করে চলবে?

আসলে মোদীজী কেন্দ্রীয় ঋণের সুদ বাবদ আগামী অর্থবর্ষ থেকে রাজ্যকে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা শোধ করতে হবে। এই অবস্থায় রাজ্যের আর্থিক দিকটি যে ভয়াবহ হয়ে উঠবে, তা বুঝতে পারছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে কারণে এখন থেকেই কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াচ্ছেন তিনি। দিদি চাপে আছেন। সেই চাপ দলের উপরে দিলে কাজ হচ্ছে না।

সুতরাং, চাপ এখন দিল্লীমুখী...

—সুন্দর মৌলিক

খালিস্থানের পথেই সম্ভব কাশ্মীর সমস্যার সমাধান

সাধন কুমার পাল

গত ১১ জুলাই উনায় দলিত নিগ্রহের খবরে উদ্বিগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল, রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্বয়ং পীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে গুজরাট ছুটে গেলেন। এদিকে এক সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুকে ঘিরে কাশ্মীর জ্বলছে। সরকারি তথ্য অনুসারে এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ৬৫ জন

প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন ৩৫৫০ জন নিরাপত্তা রক্ষী ও ২৩০৯ জন সাধারণ মানুষ। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। প্রশ্ন হচ্ছে নিজেদের সংবেদনশীল, মানবিক, সংখ্যালঘুপ্রেমী, দলিতপ্রেমী হিসেবে তুলে ধরতে সদা তৎপর এই রাজনীতিবিদরা গুজরাটের উনা, উত্তরপ্রদেশের দাদরি কিংবা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কানহাইয়া কুমারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছুটে গেলেও কাশ্মীরের পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা মুখেও আনেন না কেন? সংখ্যালঘু কিংবা দলিত ভোটের রত্নখনি নেই বলেই কি এই নেতাদের কাছে কাশ্মীর ব্রাত্য? রাহুল-কেজরিওয়াল ব্র্যান্ডের রাজনীতিকদের দ্বিচারিতার তালিকা দীর্ঘায়িত করে নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করে এটা বোধহয় বলা যায় সংবেদনশীলতা, মানবিকতা, দেশপ্রেমের মতো মনুষ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি এখন ভারতীয় রাজনীতির বাজারে সস্তা পণ্য। সংখ্যালঘু, দলিত নামে চিহ্নিত সমাজের দুর্বল পিছিয়ে পড়া মানুষ এখন রাজনীতির কারবারিদের ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানোর সিঁড়িতে পরিণত হয়েছে।

সশরীরে কাশ্মীর না গেলেও রাহুল-কেজরিওয়াল ব্র্যান্ডের রাজনীতিকরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দানে পিছিয়ে নেই। এই রাজনীতিকদের সঙ্গে পরামর্শদাতার ভূমিকায় রয়েছেন পোট্রো ডলার পুষ্ট এক শ্রেণীর সাংবাদিক, কলমচি ও বুদ্ধিজীবী। যাদের পরামর্শের মূল বক্তব্য হলো, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি-পিডিপি অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে নিজেদের এজেন্ডা রূপায়িত করতে চাইছে, যা কিনা কাশ্মীরের মানুষ মেনে নিতে পারছে না। সন্ত্রাসবাদী বুরহান ওয়ানির মৃত্যু এই ক্ষোভের আগুনে অগ্নি সংযোগ করেছে মাত্র। এই ক্ষোভ সামলাতে, কাশ্মীরের মানুষের আজাদির আওয়াজ দাবিয়ে রাখতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ওখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আফস্পা (AFSPA) তুলে দিয়ে সেনা প্রত্যাহার করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

পঞ্জাবে খালিস্থান আন্দোলনের সময় একই রকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে সুরক্ষাবাহিনী প্রত্যাহার করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সে সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যদি ওই পরামর্শ মেনে কেপিএস গিল সাহেবকে বিশ্রামে পাঠিয়ে দিতেন তাহলে আজ নিশ্চিত ভাবে বাস্তবে খালিস্থান দেখতে হোত।

সবজান্তা বুদ্ধিজীবী ও রাহুল-কেজরিওয়াল ব্র্যান্ডের রাজনীতিকরা না গেলেও এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং দুদিনের সফরে কাশ্মীরে গিয়ে স্থানীয় ভাবে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে গভীর আবেগের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। গত ২৭ জুলাই বাজার পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাস সমর্থক নৈরাজ্য-বাদীদের আহত ও নিহত হওয়ার দুঃখে কাতর জনৈক সিংহ মশায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'এখন গভীর আবেগের সম্পর্কের কথা বলছেন এতদিন কোথায় ছিলেন?'

যে দলের প্রতিষ্ঠাতা (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) কাশ্মীরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, ১৯৯২ সালে বিজেপি সভাপতি হিসেবে মুরলী মনোহর যোশী কাশ্মীরের লালচকে তেরঙ্গা তোলার কর্মসূচি ঘোষণা করে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন, ২০১১-তে যুব মোর্চার তরফ থেকে শ্রীনগরে গণতন্ত্র দিবস পালনের উদ্দেশ্যে একতা যাত্রার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টি ও পূর্বসূরি জনসঙ্ঘই একমাত্র দল যারা স্বাধীনতার পর থেকে কাশ্মীরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে, ভারতব্যাপী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। সেই পার্টির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এতদিন কোথায় ছিলেন। এটা কি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা না কী কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে

পরিস্থিতি গুলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস?

এক শ্রেণীর মিডিয়ার দৌলতে সমগ্র বিশ্বের মানুষ কাশ্মীর বলতে শ্রীনগরের ডাউন টাউনকেই জানে। ফলে কাশ্মীরি বলতে মানুষ এখানে বসবাসকারী ভারত বিরোধীদেরই বোঝে। কারণ মূলস্রোতের মিডিয়ায় বছরভর এই এলাকার ক্ষোভ বিক্ষোভ, ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপের খবরই দেখানো হয়। গ্রাউন্ড রিপোর্টিং-য়ের নামে এক শ্রেণীর রিপোর্টার, কলাম লেখক শ্রীনগরে গিয়ে আরাম আয়েশের রাজকীয় ব্যবস্থায় থেকে পাকপন্থী ব্যাবস্থাপকদের তৈরি করে দেওয়া রিপোর্ট বছরের পর বছর ধরে মূলস্রোতের মিডিয়ায় পরিবেশন করে কাশ্মীর সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে দিয়েছে।

হিজবুল কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর শ্রীনগরের ডাউন টাউনের পাথর ছোড়া ক্ষোভ বিক্ষোভের কাশ্মীর সম্পর্কে পরিচিত দৃশ্যে তাল কাটলো জি নিউজের কিছু সংবাদ প্রতিবেদন। মানুষ দেখলো কাশ্মীর মানেই শ্রীনগর নয়। শ্রীনগরের বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কাশ্মীরের মানুষ, যারা কিনা মোটেও ভারত বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল নয়। তাদের মুখে আজাদির স্লোগান নেই, ৪৭-এর আজাদিই তাদের কাছে আজাদি। পাকিস্থানের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সচেতন কাশ্মীরের বিস্তির্ণ এলাকায় বসবাসকারী প্রকৃত কাশ্মীরিরা দেশের অন্য অংশের দেশপ্রেমিক মানুষের চেয়ে কম দেশপ্রেমিক নয়। দুর্গম এলাকার বাসিন্দা এই সব কাশ্মীরিদের একটাই আফশোস ওরা ভারতকে চায় কিন্তু ভারতই ওদের আপন করে নিচ্ছে না।

কাশ্মীরের দেশপ্রেমিক মানুষের মূল সমস্যা হলো সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতা ও তাদের এজেন্ট কিছু সংবাদমাধ্যম। যারা এদের বক্তব্য, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা সর্বসমক্ষে আসতে দিচ্ছে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বিক্ষোভ প্রদর্শনের দৃশ্যে কাশ্মীরের যে এলাকা দেখানো হয় সেখানে দেশের আর দশটা উন্নত এলাকার মতো উন্নয়নের কোনো অভাব নেই। এখনে মুসলমান বিশ্ব থেকেও প্রচুর অর্থ আসে যা দিয়ে ওরা ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালায়, আরাম আয়েশে দিন যাপন করে। ভারতকে ভিলেন বানাতে এরা কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সঠিক ভাবে রূপায়ণ করতে দেয় না। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের কোনো ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে টেলিফোন, ইন্টারনেট তো দূরের কথা বিদ্যুৎ সংযোগ এমনকী পাকা রাস্তা পর্যন্ত নেই।

২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে কাশ্মীরে বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা খাতে ৮২৬৫ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এই প্যাকেজ বেড়ে হয়েছে ৯৯৯৭ কোটি টাকা। বিশেষ প্যাকেজ ছাড়া সেন্ট্রালি স্পনসরড স্কিমে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে জম্মু-কাশ্মীরে বরাদ্দ হয়েছে ৪০৭ কোটি টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এই প্যাকেজ বেড়ে হয়েছে ৪০০০ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে এই প্যাকেজ আরো বেড়ে হয়েছে ৮৮৭৬ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে প্রতিবেশী রাজ্য হিমাচল প্রদেশে সেন্ট্রাল স্পনসরড স্কিমে বরাদ্দের পরিমাণ মাত্রা ১৪৯ কোটি টাকা। রিপোর্ট বলছে হিমাচল প্রদেশে এই অর্থে যে উন্নয়ন হয়েছে তুলনায় অনেক বেশি বরাদ্দ পেয়েও কাশ্মীর তার ধারে কাছে নেই। এই পরিসংখ্যান বলছে, কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কখনো কোনো কার্পণ্য করেনি। যাদের জন্য এই বরাদ্দ তাদের কাছে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কাদের পকেটে যাচ্ছে তাদের অবশ্যই খুঁজে বের করা দরকার। ২০১৫-র নভেম্বর মাসে কেন্দ্র সরকার জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ৮০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এমন বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে কাশ্মীরের প্রকৃত ভারত ভক্তদের কাছে এই উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া যায়।

উপরের পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে কাশ্মীরের সমস্যা কোনো রকম বঞ্চনা বা অনুন্নয়নজাত সমস্যা নয়। এখানের মূল সমস্যা হলো ইসলামের সুফি মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা 'কাশ্মীরিয়ত' ক্রমশ দুর্বল হয়ে উগ্র সুন্নি-ওয়াহাবি ভিত্তিক 'কাশ্মীরিয়তের' প্রাধান্য লাভ। সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী সুফি মতবাদ দুর্বল হয়ে সুন্নি-ওয়াহাবি তন্ত্রের বাড়বাড়ন্তের জন্য কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতদের বিতাড়িত হতে হয়েছে। এই সুন্নি-ওয়াহাবি মতবাদ শুধু অন্য ধর্মের মানুষ নয় ইসলামের অন্য গোষ্ঠীর মানুষকেও কাফের বলে মনে করে। সমগ্র বিশ্বে সুন্নি-ওয়াহাবি ইসলামের খেলাফত প্রতিষ্ঠার নামে আইসিস, আলকায়দার মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি যে আতঙ্ক ও নৃশংসতার পরিবেশ তৈরি করেছে কাশ্মীরের অস্থিতিশীল অবস্থা তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সুন্নি-ওয়াহাবি ইসলামের এই অশুভ চক্রান্তে প্রত্যক্ষ মদত জোগাচ্ছে পাকিস্তান ও পাকিস্তান ভিত্তিক কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। ভিটেচ্যুত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ব্যাপারে নীরব থাকলেও ন্যায় বিচার, আজাদি, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের নামে সুন্নি-ওয়াহাবি কাশ্মীরীদের নানাভাবে মদত যোগাচ্ছে পাকিস্তানি আরবি অর্থে পুষ্ট কিছু ভারতীয় লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক।

খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বে ইসলামি সন্ত্রাসের যে কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরের অস্থিরতা তারই অঙ্গ। আলোচনা বা কোনোরকম আপোশ রফার মাধ্যমে ইসলামি সন্ত্রাস নামক নরমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে আটকানো সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সর্বাত্মক সশস্ত্র প্রতিরোধ। কাশ্মীরেও এই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ছিনিয়ে আনতে হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকেও।

খালিস্থান পন্থীদের নিকেশ করে পঞ্জাবকে যেমন প্রকৃত পঞ্জাবিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তেমনি ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর আজাদি পন্থী, পাক পন্থী কাশ্মীরিদের নিকেশ করে কাশ্মীরকেও তুলে দিতে হবে প্রকৃত কাশ্মীরিদের হাতে।

মানুষের পাপে ক্লিষ্টা পতিতপাবনী গঙ্গা

সন্দীপ চক্রবর্তী

১৯০৫ সাল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ এবং নাব্যতা ফিরিয়ে দেবার জন্য স্থাপন করলেন গঙ্গা মহাসভা। সেটাই ছিল গঙ্গার শুদ্ধিকরণের প্রথম প্রয়াস। দীর্ঘ টালবাহানার পর তৎকালীন বৃটিশ সরকার ১৯১৪ সালের ৫ নভেম্বর মানতে বাধ্য হলো, অবাধ ও সুস্থ গঙ্গা হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার। 'অবিরল গঙ্গা সমঝোতা দিবস' হিসেবে দিনটি স্থান পেল ইতিহাসে। এরপর আরও প্রায় দু' বছরের অপেক্ষা। ১৯১৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হলো চুক্তি। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কোনো

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার গঙ্গার স্বাস্থ্য ও শ্রী ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবেনি। গাঙ্গেয় সমতল অঞ্চলে সেচের কাজে গঙ্গার জল যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে গঙ্গা ক্রমশ নিকাশী নালায় পরিণত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গঙ্গাকে পুনর্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সরকারের পরিকল্পিত গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (ফেজ ১ এবং ২) ব্যর্থ হয়। ১৫ বছরে মোট ৯০১৭ কোটি টাকা খরচ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। ২০০০ সালের ৩১ মার্চ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার।

২০১৪ সালের মে মাসে বারাণসী থেকে নির্বাচিত হবার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'মা গঙ্গার সেবা করা আমার নিয়তি।' কথাটা যে নিছক মুখের কথা ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর নিজের দেওয়া ব্যাখ্যায়। কয়েকমাস পর নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমরা যদি গঙ্গা পরিষ্কার করতে পারি তা হলে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ উপকৃত হবেন। নির্মল গঙ্গা অভিযান যতটা সাংস্কৃতিক ঠিক ততটাই অর্থনৈতিক কর্মসূচি।' প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার প্রতিফলন ঘটল কেন্দ্রের বাজেটে। ২০১৪ সালের ১০ জুলাই অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি একটি সুসংহত গঙ্গা শুদ্ধিকরণ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন, যার নাম 'নমামি গঙ্গে'। প্রাথমিক ব্যয়বরাদ্দ স্থির হলো ২০৩৭ কোটি টাকা। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় নির্বিচারে বর্জ্য ফেলার অভিযোগে উত্তর ভারতের ৪৮টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

নমামি গঙ্গের মোট ব্যয়বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা। ৫ বছর ধরে এই টাকা খরচ করা হবে। এর আগে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪০০০ কোটি টাকা। পরে দ্বিগুণ খরচ করেও সামাল দেওয়া যায়নি। অর্থাৎ বাস্তব প্রয়োজন উপলব্ধি করে প্রকল্পের অর্থনৈতিক ভিতটি মোদী সরকার গোড়া থেকেই মজবুত করার কথা ভেবেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আরও একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, নমামি গঙ্গের সমস্ত কাজই হবে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্র সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি মডেলে (পিপিপি মডেল) প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করতে চাইছে। তাও অন্তত দশ বছরের জন্য। একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটিও একটি বাস্তবানুগ ভাবনা।

নদীর রক্ষক রাখার কথা বোধহয় কেউ কখনও শোনেনি। কিন্তু নমামি গঙ্গের অন্যতম প্রধান একটি অঙ্গ হলো ৪ ব্যাটেলিয়ন গাঙ্গেয় পরিবেশ রক্ষীবাহিনী গঠন। যেসব জায়গায় গঙ্গার দূষণ অস্বাভাবিক সেখানে এই বাহিনী নজরদারি চালাবে। প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করার এবং আদালতে পেশ করার ক্ষমতাও তাদের থাকবে। নদীকেন্দ্রিক কোনো প্রকল্প আদতে জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন হলেও অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের অভাবে অনেকসময় কাজ আটকে যায়। এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যেসব বিনিয়োগ করা হবে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, পানীয় জল ও নিকাশী মন্ত্রক, পরিবেশ অরণ্য ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

নমামি গঙ্গের মূল প্রতিপাদ্য গঙ্গার দূষণ কমানো এবং যতটা সম্ভব তা প্রতিরোধ করা। গঙ্গার বিপুল দূষণের হদিশ দেওয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে অসম্ভব। স্রেফ আন্দাজ করার জন্য একটা পরিসংখ্যান সারণিতে দেওয়া হলো।

সারা ভারতে কানপুর এবং কলকাতার গঙ্গা সব থেকে দূষিত বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত। কানপুরের গঙ্গায় মাত্র ১০০ মিলি

জলে ২৪ লক্ষ কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। স্বাভাবিকের তুলনায় যা ৪৮ গুণ বেশি।

নমামি গঙ্গে প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জলের শুদ্ধিকরণের ওপর। এর জন্য ব্যবহার করা হবে জৈব প্রযুক্তি। দূষিত জলকে বর্জ্য ও জীবাণুমুক্ত করে গঙ্গায় ফেলা হবে। সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং নিকাশী ব্যবস্থারও আমূল সংস্কার করা হবে। যেসব জায়গায় ভূগর্ভস্থ নিকাশী ব্যবস্থা নেই সেখানে তা গড়ে তোলা হবে।

এই প্রকল্পের অধীন কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে গঙ্গার উপরিভাগে ভাসমান কঠিন বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করা হবে। জোর দেওয়া হবে গ্রামে গ্রামে শৌচাগার নির্মাণ কর্মসূচির ওপর যাতে বৃষ্টির জলে মলমূত্র সরাসরি গঙ্গায় না এসে পড়ে। সংস্কার করা হবে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিগুলির। কারণ প্রায়ই অদগ্ধ বা অর্ধদগ্ধ শব গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। এছাড়া রয়েছে ঘাট সংস্কার কর্মসুচি। দ্বিতীয় পর্যায়ে হাত দেওয়া হবে পৌরসভা এবং শিল্পকেন্দ্রিক দূষণ প্রতিরোধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরসভাগুলির ভূগর্ভস্থ নালা যেমন গঙ্গায় এসে মিশেছে, ঠিক তেমনি ছোট বড়ো নানা কারখানা তাদের দূষিত বিষাক্ত বর্জ্য নিত্যদিন ঢেলে দিচ্ছে গঙ্গার বুকে। তার জন্য অতিরিক্ত ২৫০০০ কোটি লিটার জল শোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পুরসভার অধীনে। এই কাজ শেষ করতে সময় লাগবে ৫ বছর। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিটি পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তা দীর্ঘদিন ধরে সুফল দিতে পারে। সর্বাধিক দূষণ সৃষ্টিকারী প্রত্যেকটি কারখানাকে ইতিমধ্যেই দূষণ প্রশমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উন্নত দেশে জল নিষ্কাশনের মাধ্যমে বর্জ্যকে কঠিন বা অ-তরল করে তোলা হয়। এই রূপান্তরিত বর্জ্য পরিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ভারতেও এই ব্যবস্থা যথাশীঘ্র চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে নমামি গঙ্গে প্রকল্পে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এর আগের গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধ কর্মসূচিগুলি বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়েছে। মোদী সরকার প্রথম থেকেই প্রকল্পের রাশ রেখেছে নিজেদের হাতে। অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে দেশের দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডগুলির হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সময়সীমা। এমনকী রাখা হয়েছে মূল্যায়নের অবকাশও। অর্থাৎ শুধু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করলেই চলবে না, সেই কাজ উৎকর্ষের বিচারে সেরা হতে হবে।

রাজ্যের নাম	গঙ্গার দৈর্ঘ্য	গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত পয়ঃপ্রণালীর সংখ্যা	দূষিত জলের পরিমাণ (প্রতিদিন)
উত্তরাখণ্ড	৪৫০ কিমি	১৪	৪৪০০ কোটি লিটার
উত্তরপ্রদেশ	১০০০ কিমি	৪৩	৩২,৭০০ কোটি লিটার
বিহার	৪০৫ কিমি	২৫	৫৮০০ কোটি লিটার
ঝাড়খণ্ড	৪০ কিমি	—	—
পশ্চিমবঙ্গ	৫২০ কিমি	৫৪	১৭৮০০ কোটি লিটার

গঙ্গার জলদূষণের জন্য প্রধানত (৭০ শতাংশ) দায়ী চিনি, কাগজ এবং আবগারী শিল্প। সারা দেশে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে প্রায় ৭৬৪টি শিল্প কারখানা রয়েছে। এরা গঙ্গা থেকে প্রতিদিন ১১,২৩০ কোটি লিটার জল নেয় এবং ৫০০ কোটি লিটার বর্জ্য মেশানো দূষিত জল গঙ্গায় ঢেলে দেয়। এছাড়া রয়েছে চর্মশিল্প। শুধু উনাও অঞ্চলের ট্যানারিগুলি থেকে প্রত্যেক বছর ১.১২৫ টন ক্রোমিয়াম ও আর্সেনিক গঙ্গার জলে মেশে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই দূষণ শুধু গঙ্গার জল শোধন করে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। পরিস্রুত জলের জোগান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর জন্য আবার ভারতকে প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর নির্ভর করতে হবে। নেপাল নিজের দেশে প্রবাহিত নদীতে অনেকগুলি জলাধার বানিয়েছে সেচের জন্য। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নদী ভারতে প্রবেশ করে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু নেপাল সব জল টেনে নেওয়ায় পরিস্রুত জল গঙ্গা খুব একটা পায় না। অথচ নেপালের নদীগুলির (যে নদী ভারতের কোনো নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে) জলে নিম্ন-সমতলবর্তী দেশ হওয়ার সুবাদে ভারতেরও অধিকার আছে। ঠিক যে নিয়মে ভারত বাংলাদেশকে জলের ভাগ দেয়। ভারত তাই নেপালের সঙ্গে এ ব্যাপারে চুক্তি করার কথা ভাবছে। নেপালের নদী থেকে জল পেলে গঙ্গায় পরিস্রুত জলের পরিমাণ বাড়বে।

নমামি গঙ্গে প্রকল্পের আরেকটি প্রস্তাব মানস সরোবরের জলের অভিমুখ বদলে গঙ্গায় আনা। এর জন্য গঙ্গার দুই শাখানদী ঘর্ঘরা এবং কারনালি সব থেকে উপযুক্ত। কারণ ঘর্ঘরার উৎস তিব্বতে ও কারনালির নেপালে। মানস সরোবরের উপরিতলের আয়তন ৩২০ স্কোয়ার কিলোমিটার। সরোবরের সর্বোচ্চ গভীরতা ৯০ মিটার (৩০০ ফিট)। এখন মানস সরোবরের জল স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সরোবরের অতিরিক্ত জল চীনের কারনালি নদী অববাহিকায় ১৫ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে গঙ্গায় নিয়ে আসতে কোনো অসুবিধে নেই।

পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার যেসব জায়গায় সমুদ্র অগভীর সেখানে কৃত্রিম উপায়ে পরিস্রুত জলের আধার তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। উদ্দেশ্য গঙ্গার ক্ষীয়মাণ প্রবাহে প্রাণসঞ্চার। এই জলাধারগুলিতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের বন্যার জলও ধরে রাখার কথা ভাবা হয়েছে যাতে তা শোধনের পর সেচ এবং শিল্পের কাজে লাগানো যায়। অর্থাৎ যাতে গঙ্গার ওপর চাপ কমে।

সব মিলিয়ে নমামি গঙ্গে একটি যুগান্তকারী প্রকল্প। প্রত্যেক ভারতীয়ের সঙ্গে গঙ্গার নাড়ির যোগ। সেই গঙ্গা মানুষের পাপ বহন করতে করতে আজ ক্লান্ত। তাকে পুনর্জীবিত করে তোলা সারা দেশের দায়। সৌভাগ্য, মোদী সরকার এই দায় গ্রহণ করেছেন। অপেক্ষা শুধু গঙ্গার সুস্থ হয়ে ওঠার। মহাদেবের জটায় যাঁর অবস্থান তাঁকে অসুস্থ দেখতে ভালো লাগে না।▮

গঙ্গা : জাতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উপায়

অম্লানকুসুম ঘোষ

পুণ্যতোয়া গঙ্গা আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক চেতনায়, সমাজমানসে ও ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। গঙ্গা আমাদের কাছে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ছাড়াও শুধুমাত্র পার্থিব দৃষ্টিতে গঙ্গার এক বিরাট অর্থনৈতিক গুরুত্ব আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে রয়েছে। দূষণমুক্ত গঙ্গার অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রসূত সদ্ব্যবহারের দ্বারা ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব। আলোচনায় দেখা যাক।

গঙ্গা এক দীর্ঘ নদী। তুষারশুভ্র হিমালয়ের থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এর গতিপথ। এই দীর্ঘ গতিপথে দুই তীরকে আগাগোড়া পলিতে সমৃদ্ধ করেছে গঙ্গা। তাই প্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গা ভারতবাসীর অর্থনীতির এক বড় চালিকাশক্তি। অবশ্য শুধু গঙ্গা নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সভ্যতার উষালগ্নে কোনো না কোনো নদীই ছিল অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। শিকারজীবী যাযাবর জীবন ছেড়ে যেদিন মানুষ কৃষিজীবী হয়ে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করল সেদিন থেকেই মানুষ অন্নবস্ত্রের জন্য নদীর ওপরে নির্ভরশীল। তাই পৃথিবীর প্রাচীনতম চারটি সভ্যতাই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল (সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশর সভ্যতা, টাইগ্রিস- ইউফ্রেটিসের তীরে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ও হোয়াংহো-ইয়াং-সিকিয়াং-এর তীরে চীনা সভ্যতা)। এছাড়া লাতিন আমেরিকার রহস্যময় মায়া, অ্যাজটেক ও ইনকা সভ্যতাও আমাজনের প্রবাহসৃষ্ট। মানব সভ্যতা ক্রমে উন্নত হয়েছে। তার চাহিদা এবং সেই চাহিদা পূরণের উপায় সবই বদলেছে। মানবসভ্যতার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর থেকে শিল্পনির্ভর (অর্থাৎ খনিজ সম্পদ নির্ভর) হয়েছে। উন্নততর জলযান তৈরিতে সক্ষম মানুষের বাণিজ্য নদীপথের বদলে সমুদ্রপথকে আপন করে নিয়েছে। কৃষিতে সেচের জন্য ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মানবসমাজ ক্রমশ নদীর জলের পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। মানবসভ্যতার প্রাণকেন্দ্রগুলি তাই আজ আর নদীতীরে অবস্থিত নয় বরং সমুদ্রতীরই এখন তার প্রধান ঠিকানা। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। গঙ্গাতীরের বারাণসী, প্রয়াগ, পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা), শিপ্রাতীরের উজ্জয়িনী, গোদাবরীতীরের কাঞ্চী প্রভৃতি শহর ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক কারণে প্রসিদ্ধ হলেও এখন আর জাতীয় অর্থনীতির ভরকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয় না। এমতাবস্থায় গঙ্গাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা কি সফল হবে? বিশেষত, যেখানে ৭০০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের নীল, আমাজন, ৬৫০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের হোয়াংহো-ইয়াং-সিকিয়াং, ৬২৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মিসিসিপি- মিসৌরি, ৫০০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের কঙ্গো প্রভৃতি দৈত্যাকার নদীই তাদের নিজেদের দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয় না সেখানে মাত্র ২৫২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের গঙ্গা কি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশসাধনের সহায়ক হবে?

অবশ্যই হবে। কালক্রমিক বিবর্তনে মানবসভ্যতার অর্থনীতির ভরকেন্দ্র নদী থেকে সমুদ্রাভিমুখী হলেও এখনও ভারতীয় অর্থনীতির গঙ্গাকেন্দ্রিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব। কারণ সভ্যতার জন্মদাত্রী অন্য নদীসমূহের সঙ্গে গঙ্গার বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। বিশ্লেষণে দেখা যাক।

প্রথমত, গঙ্গার উৎপত্তি বিশ্বের বৃহত্তম পর্বতমালা হিমালয় থেকে হওয়ায় গঙ্গায় সারা বছর বরফগলা জল থাকে। সে অন্য নদীসমূহের মতো বর্ষানির্ভর নয়। গঙ্গার দ্বারা পরিবাহিত মোট জলরাশির পরিমাণ গড়ে দৈনিক প্রায় ৪৫৯০৪ কোটি ঘনমিটার বা ৪৫৯.০৪ ঘন কিলোমিটার যা ১৫ কিমি দীর্ঘ ও ৩০ কিমি প্রস্থ ও ১০০০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট এক সাগরের সমান। অর্থাৎ গঙ্গার দ্বারা পরিবাহিত জলরাশির দ্বারা একদিনে ১৫ কিমি দীর্ঘ ও ৩০ কিমি প্রস্থ ও ১০০০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট এক সাগর নির্মাণ করা সম্ভব আর সারা বছর ধরে এই জলকে

সঞ্চয় করলে ২১০ কিমি দীর্ঘ ও ১০৫ কিমি প্রস্থ ও ৭০০০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট এক সাগর নির্মাণ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, গঙ্গার উৎপত্তিস্থল হিমালয় পাললিক শিলা নির্মিত বলে গঙ্গা উৎপত্তিস্থল থেকে মধ্যগতিতে আসার আগে পর্যন্ত প্রচুর পলি (পাললিক শিলা চূর্ণ) সংগ্রহ করে (গঙ্গার দ্বারা দৈনিক পরিবাহিত মোট পলির পরিমাণ ২১ কোটি টন যা ওজনের দিক দিয়ে এযাবৎকাল পর্যন্ত মানুষের তৈরি সর্ববৃহৎ বস্তু খুখুর পিরামিডের ৩২ গুণ)। এই পলির দ্বারা নিজের মধ্য ও নিম্নগতির তীরভূমিকে সমৃদ্ধ করে। মোহনায় সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এই পলির জন্যই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের। প্রচণ্ড উর্বর এই ব-দ্বীপের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার যা আয়তনে ফ্রান্সের চেয়েও বেশি।

তৃতীয়ত, নীল, হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, সিন্ধু ও আমাজন এগুলির বেশিরভাগই নদ অর্থাৎ এদের থেকে শাখানদী নির্গত হয়নি। বাকিগুলি নদী হলেও অর্থাৎ এদের থেকে শাখানদী নির্গত হলেও সেগুলির সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই এই সব নদ-নদী বিধৌত অঞ্চল শুধুমাত্র এদের গতিপথের দুধারেই সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিক কারণেই এগুলির তীরে সৃষ্ট সভ্যতাগুলি দীর্ঘ হলেও প্রস্থে বড়ই ক্ষীণ। গঙ্গা এখানেই ব্যতিক্রমী। প্রচুর শাখানদী ও উপনদী নিয়ে গঙ্গাবিধৌত অঞ্চল বা গাঙ্গেয় উপত্যকা গঙ্গার তীর থেকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। নদীজল-সেবিত কৃষিক্ষেত্রও তুলনায় অনেক বেশি। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার হিসেব অনুযায়ী গঙ্গা বিধৌত অঞ্চল প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (দৈর্ঘ্য ২৫০০ কিলোমিটার ও প্রস্থে ১০০০ কিলোমিটার) যেখানে নীল নদের বিধৌত অঞ্চল মাত্র ৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (৭০০০×১০০), ট্রাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের বিধৌত অঞ্চল ৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (২৫০০×২০০), হোয়াংহো-ইয়াং- সিকিয়াং-এর বিধৌত অঞ্চল ৭.৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (৬৫০০ × ১৩০)। এই বিশাল গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলে গঙ্গাজল-সেচ-সেবিত কৃষিক্ষেত্র আছে প্রায় ৫ কোটি হেক্টর এবং গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলে বসবাস করে অন্যূন ৪০ কোটি মানুষ, যে সংখ্যাটা বিশ্বের ২৮৩টি দেশের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এখন দেখা যাক গঙ্গার এইসব ব্যতিক্রমী গুণাবলী কীভাবে তার নিজের পুনরুজ্জীবনের ও সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির বিকাশসাধনের সহায়ক হয়।

পানীয় জল বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতিতে এক বড় জায়গা দখল করে আছে। বর্তমানে আর্সেনিক ও অন্যান্য নানারকম দূষণের কারণে ভূগর্ভস্থ জল পানের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা ভূগর্ভস্থ জলের পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠের জলকে বেশি ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় পানীয় জল ব্যবসার এক বড় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে বর্তমানে দৈনিক একশো কোটি ডলার পানীয় জল বিক্রি হয়। ভারতে এই অঙ্কটি দৈনিক একশো কুড়ি কোটি টাকার (২ কোটি ডলারের কিছু কম)। দুর্ভাগ্যবশত এই বিপুল বাণিজ্যের সিংহভাগই বিদেশি কোম্পানিগুলির দখলে। গঙ্গার বিপুল জলভাণ্ডারকে পরিশুদ্ধ করে পানের উপযোগী করে দেশের লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করলে শুধুমাত্র পানীয় জল বিক্রি করে আমাদের দেশ থেকে বিদেশি কোম্পানিগুলি এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যেতে তো পারবেই না বরং এই পরিশুদ্ধ পানীয় জলকে বোতলজাত করে আমরা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় করতে পারবো। তার ফলে একদিকে যেমন দেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট) কমানো যাবে, অন্যদিকে জল পরিশোধনের কাজে নতুন কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগও পাওয়া যাবে, আর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি মানেই চাহিদা বৃদ্ধি আর চাহিদা বৃদ্ধি হলে সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার অর্থ একদিকে যেমন দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি। অন্যদিকে এরই ফলে উৎপাদনকারী শ্রমশক্তির অধিক প্রয়োজন হয় অর্থাৎ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়, এরপর বেকারত্ব দূর হয় অর্থাৎ জনসাধারণের উপার্জন বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ পুনরায় চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ পুরনায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এভাবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সেই চক্রের মধ্যে প্রবেশ করা যেখানে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণ উভয়ই একসঙ্গে হয় এবং তা পুনঃ পুনঃ হতে থাকে।

গঙ্গাজল বিক্রির উদ্যোগ সরকারের।

মিষ্টি জল বর্তমান বিশ্ব-আর্থ-রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক। পৃথিবীর মোট ভূপৃষ্ঠের চারভাগের তিনভাগ জল হলেও সেই বিপুল জলরাশির মাত্র ৩ শতাংশ মিষ্টি জল যা মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ও কৃষিক্ষেত্রে সেচকর্মের জন্য ব্যবহার করা যায়। এর দুই-তৃতীয়াংশ আবার বরফ হিসেবে সঞ্চিত আছে মেরুদ্বয়ে ও হিমালয়ে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য মিষ্টি জলের সেই সামান্য ভাণ্ডারও আজ ক্রমক্ষীয়মাণ। ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরুদ্বয় ও হিমালয়ের বরফ ক্রমশ গলছে। তাই মিষ্টি জলের জন্য হাহাকার বাড়ছে। ভবিষ্যত

গঙ্গাজল সেচ-সেবিত কৃষিক্ষেত্র।

বিশ্ব-আর্থ-রাজনীতিতে মিষ্টি জলের গুরুত্ব তাই আরো বেশি হবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন আজকের পৃথিবী যদি তেলের হয়, তাহলে কালকের পৃথিবী হবে জলের। এখানেই ভারতের অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনা আর সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণই গঙ্গাকেন্দ্রিক। মেরুদ্বয়ের বরফ বেশি পরিমাণে গলার ফলে যে পরিমাণ মিষ্টি জলের উৎপত্তি হচ্ছে তা সমুদ্রে পড়ছে সরাসরি অর্থাৎ সেই মিষ্টি জল সম্পূর্ণই নোনা জলে পরিণত হচ্ছে। হিমালয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা। এক্ষেত্রে বরফগলা জল গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র প্রতিটি নদ-নদী দ্বারা বাহিত হয়ে উত্তর ভারতের সমভূমিকে অতিক্রম করে তারপর সমুদ্রে পড়ে। অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সৃষ্ট অতিরিক্ত বরফগলা জলও উত্তর ভারতের সমভূমিকেই পুষ্ট করবে। এর মধ্যে সিন্ধু বেশিরভাগই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ও ব্রহ্মপুত্র উৎসে চীনের ও মোহনায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র গঙ্গাই সম্পূর্ণরূপে ভারতের অন্তর্গত (মোহনার একটি অংশ বাদে)। অর্থাৎ গঙ্গাবক্ষ দিয়ে বয়ে চলা অতিরিক্ত বরফগলা জল সম্পূর্ণভাবেই ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই অতিরিক্ত বরফগলা জলকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত সেচ করা যায়, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং কৃষিক্ষেত্রকে আরও মজবুত করবে।

অতিরিক্ত সেচের ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে ঠিক নদীতীরস্থ এলাকাতেই নদীর জলের দ্বারা চাষ হয়। বাকি সমস্ত জায়গাতেই ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলনের দ্বারা চাষ হয়। এতে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় এবং ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার ক্রমাগত কমতে থাকে যা পরিবেশের ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। এমতাবস্থায় গঙ্গার বিপুল জলভাণ্ডারকে পাইপলাইনের দ্বারা নদীতীর- দূরবর্তী এলাকাতেও পাঠিয়ে সেই জলের দ্বারা চাষ করলে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারকেও রক্ষা করা যায় আবার আর্সেনিক বা অন্যান্য দূষণের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। উপরন্তু বিদ্যুতের দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের প্রয়োজন না হওয়ায় বিদ্যুৎ খরচও বাঁচে। ফলে একদিকে চাষের খরচ কমে ফলে চাষীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বাড়ে যা উৎপাদন বাড়ায় ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে যা নতুন করে চাহিদা বাড়ায়। অন্যদিকে উদ্বৃও বিদ্যুৎ শিল্পের বিকাশের সহায়ক হয় যা নতুন করে বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের ও নতুন কর্মসংস্থানের নবদিগন্ত উন্মোচিত করে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সেই চক্রের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

এছাড়াও অর্থনীতি ও পরিবেশের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দিককে গঙ্গার মাধ্যমে রক্ষা ও বিকশিত করা সম্ভব। গঙ্গায় প্রচুর জলজ জীব ও উদ্ভিদ বাস করে। জীববৈচিত্র্যে বিপুল সম্ভার গঙ্গায় দেখতে পাওয়া যায়। গাঙ্গেয় ডলফিন (বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় মিষ্টি জলের স্তন্যপায়ী প্রাণী) থেকে শুরু করে গঙ্গায় অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতি জু-পাংকটন, গাঙ্গেয় ভোন্দর (এশিয়ার বৃহত্তম মিষ্টি জলের উভচর) থেকে শুরু করে গঙ্গায় অবস্থিত ক্ষুদ্রতম ফাইটো-পাংকটন। বাস্তুতন্ত্রের সবকটি স্তরই গঙ্গায় দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশকে রক্ষার স্বার্থেই গঙ্গার এই বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা জরুরি আর এই জরুরি কাজটি করতে গিয়েই দেশের অর্থনীতির ও পরিবেশের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অর্থনীতি ও পরিবেশের সেই নতুন দিগন্তটি হলো পরিবেশ-ভ্রমণ বা ইকো-ট্যুরিজম। পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে গঙ্গার এই বিপুল জীবসম্পদকে বিশ্বের পর্যটককূলের সামনে যতটা সম্ভব তুলে ধরতে পারলে বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের (যা বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারকে স্ফীততর করবে) ও নতুন কর্মসংস্থানের এক বিরাট সুযোগ পাওয়া যাবে।

এছাড়া নদীপথের মাধ্যমে নৌ-পরিবহণের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরস্থ বাণিজ্যের সহায়ক পণ্য পরিবহণ করা যেতে পারে। সড়কপথে পরিবহণের তুলনায় তাতে খরচ অনেক কম পড়ে, যার ফলে পরিবাহিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য কিছুটা হলেও কমে। ক্রেতার কিছুটা অর্থসাশ্রয় হয় অর্থাৎ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, ফলস্বরূপ চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সেই চক্রের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করা যায়।

তাৎক্ষণিক অর্থনীতি ও চিরকালীন পরিবেশনীতি এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার সভ্যতাকে দীর্ঘজীবী করে। সেই ভারসাম্য রক্ষার কাজেই পুণ্যতোয়া গঙ্গা আমাদের মস্ত সহায়ক। ■

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা

অভিমন্যু গুহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' গানটি শুনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মন্তব্য করেছিলেন যে প্রত্যেক হিন্দুর উচিত এই গানটি গাওয়া। নদীমাতৃক দেশে নদী আলাদা সর্যাদা পাবে, জনমনে পূজিত হবে সেটা নতুন কথা নয়। কিন্তু স্বয়ং নদী দেবীরূপে পূজ্যা, পুরাণ-ইতিহাসে তার অবিসংবাদিত উপস্থিতি, তার থেকে বড়ো কথা পবিত্রতার সঙ্গে জনমানসে বিরাজতা— জগতের ইতিহাসে এমনটি বিরল। 'গঙ্গাজলের মতো পবিত্র'— এই প্রবাদ গাথার পাশাপাশি গঙ্গাস্নানের মধ্য দিয়ে যে একধরনের পুণ্য-লোভাতুর মন-কাতরতা, সবমিলিয়ে ভারত-মানসে গঙ্গা কেবল একটি নদীর নাম নয়, এক সভ্যতার নাম। বহু প্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গার পাড়ে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল একের পর এক শহর। পরবর্তীকালে স্থানাভাবে গঙ্গার থেকে দূরবর্তীস্থানে জনপদের পত্তন হলেও সামাজিক কৌলীন্য গঙ্গা তীরবর্তী আর গঙ্গা-দূরবর্তী স্থানের পার্থক্য আমাদের অবশ্যই নজরে পড়বে। লোক-সংস্কৃতির বহমানতা জড়িয়ে রয়েছে গঙ্গা নদীর পরতে পরতে। এবার তা চেখে দেখার পালা :

কুম্ভ :

দু'টি কুম্ভমেলার সঙ্গে গঙ্গার অবিচ্ছেদ্য যোগ। রাশি-নক্ষত্র মিলিয়ে গঙ্গাতীরের বর্ধিষ্ণু শহর হরিদ্বার ও এলাহাবাদ (প্রয়াগ)-এ পালা করে কুম্ভমেলা আয়োজিত হয়। বারো বছর অন্তর হয় পূর্ণকুম্ভ। এই উপলক্ষে গঙ্গা তীরবর্তী ওই শহর দু'টিতে যে জনসমাগম হয় তা অকল্পনীয়। কুম্ভে এসে গঙ্গায় ডুব দিলে সমস্ত পূর্ব-কৃতকর্মের দোষ দূর হয়ে যাবে আর অমরত্ব লাভের আশায় দূর-দূরান্ত থেকে হিন্দু- পুণ্যার্থীর ঢল নামে এখানে। এর পেছনে যে পৌরাণিক কাহিনিটি নিহিত আছে তা হলো, সমুদ্রমন্থন করে যে অমরত্বের অমৃত কলস উত্থিত হয়েছিল, তা নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সহস্রাধিক বছরের সংগ্রাম। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অসুরদের হাত থেকে সেই অমৃতকুম্ভ উদ্ধার করে পালানোর সময় চারটি জায়গায় রাখেন। কলস থেকে গড়িয়ে পড়ে অমৃত এই ধরণীর চারটি স্থানে হরিদ্বার, উজ্জয়িনী, নাসিক ও এলাহাবাদ (প্রয়াগ)। হিন্দুদের বিশ্বাস কুম্ভমেলায় গঙ্গায় ডুব দিলে শুধু পুণ্যার্জনই হবে না, সেই অমৃতকলস থেকে গড়িয়ে পড়া অমৃতেরও আস্বাদ পাবে তারা, তার ফলেই মিলবে অমরত্ব। বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর। একদিকে দেশবাসী পুণ্যার্থীর ঢল, অন্যদিকে ভিনদেশী পর্যটক— ওই চারটি প্রাচীন জনপদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি যে এরাই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বারাণসী :

গঙ্গা তীরবর্তী প্রতিটি জনপদেরই একটা আলাদা মহিমা রয়েছে। কলকাতার কথাই ধরুন। হাজার খানেক বছর আগে এই শহরের যে অস্তিত্বই থেকে থাকুক না কেন, প্রতিষ্ঠিত জোব চার্নকের কলকাতার বয়স মাত্র সোওয়া তিনশো বছরের। ভারতের বহু প্রাচীন জনপদের তুলনায় এই আধুনিক কলকাতা তো নেহাত সেদিনের শিশু। এমনকী মেরেকেটে পাঁচশো-ছশো বছরের পুরোনো কলকাতার পার্শ্ববর্তী চৈতন্যের স্মৃতিধন্য পানিহাটির মহোৎসবতলা ঘাট, খড়দহের শ্যামসুন্দর তলার তুলনায়ও কলকাতা নেহাতই হাঁটুর বয়সী। তা সত্ত্বেও কলকাতার গঙ্গা তীরবর্তী বাগবাজার-কুমোরটুলি অঞ্চলের যে দেব-মহিমা তা কি অস্বীকার করা যায়?

সেদিন জাত কলকাতারই যখন এই অবস্থা তখন খৃস্টেরও জন্মের প্রায় ছশো বছর আগে গড়ে ওঠা বারাণসী বা বেনারস শহরে দেবমহিমা পুণ্যলোভাতুর মনে কী অপরিসীম শ্রদ্ধায় জায়গা করে নেবে তা সহজেই অনুমেয়। পুরাণ বলছে, ভগবান শিবের থেকে উৎপত্তি বারাণসী শহরের। আর ইতিহাস বলছে হিন্দু ও জৈনধর্মে সাতটি পুণ্যতম শহরের মধ্যে সেরা এই জনপদটিই। দশাশ্বমেধ ঘাট, মনিকর্ণিকা ঘাট, পঞ্চগঙ্গা ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট ইত্যাদি ঘাটগুলি হিন্দুদের কাছে নিছক গঙ্গাস্নানের জায়গা নয়; এগুলি বরং হিন্দুদের অতি পবিত্র মহাতীর্থ। এখানকার গঙ্গাস্নানের এবং গঙ্গাজলের যে মহিমা ক্রমশ ব্যপ্ত হয়েছে, তাতে গঙ্গা নদীর অপরিহার্যতা শুধু আধ্যাত্মিক জীবনেই নয়,

বারাণসীতে গঙ্গারতির দৃশ্য।

সাংস্কৃতিক এমনকী বাণিজ্যিক জীবনেও প্রমাণিত হয়।

গঙ্গার ঘাট :

ভারতে গঙ্গা তীরবর্তী ঘাটের সংখ্যা কয়েকশো। এর কিছু পরিচয় উপরেই দিয়েছি। এখানে বিশেষভাবে বলা দরকার দৈনন্দিন প্রয়োজনে এবং পুণ্যলাভে গঙ্গাস্নানেই গঙ্গার ঘাটের কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ নয়। বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র ঘাট-সহ কলকাতার কেওড়াতলা, নিমতলা ঘাট আজ মহাশ্মশানে রূপান্তরিত। শবদাহের ভস্ম গঙ্গায় ভাসালে আবার পরপারের পথ সুগম হয়, হিন্দুদের এই বিশ্বাস ভারতে বহু জায়গায় গঙ্গার ঘাটের পাশে শশ্মান নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

এছাড়া গঙ্গার ঘাট মানেই ঠাকুর বিসর্জনের পালা। ইদানীং আমাদের অসচেতনতা বিসর্জন-জনিত কারণে হয়তো কিছু দূষণের সৃষ্টি করছে কিন্তু এর প্রতিবিধানে যে মূল পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে অর্থাৎ গঙ্গায় বিসর্জন বন্ধ করে দেওয়া তা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য তো নয়ই, এর স্থায়ী সমাধানও হতে পারে না। নদী বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে দেখেছেন গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন গঙ্গা দূষণের কারণ নয় এমনকী গঙ্গার নাব্যতা হ্রাসেরও কারণ নয়। কিন্তু পুজোর নানা উপকরণ ও উপাচার প্লাস্টিকে মুড়ে যেভাবে গঙ্গায় ফেলা হয় তা নিতান্তই দূষণীয়। এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে গঙ্গা দূষণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যাবে।

গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বহু বিখ্যাত মন্দির। এরাজ্যে খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দিরের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। বারাণসীতে রয়েছে বিখ্যাত অন্নপূর্ণা ভবানী মন্দির। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো সারার কেতা ও প্রথা আমাদের মধ্যে বহুদিনই বিদ্যমান। সেই দৃষ্টিতে গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন মন্দিরগুলি স্বতন্ত্র মাহাত্ম্যের দাবি রাখে বটে। এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ দক্ষিণেশ্বরে রাণি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির। যে মন্দিরে একদা পূজারি ছিলেন কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আজ তিনি নিজেই পূজ্য।

গঙ্গায় পূজায়োজন :

পুজোর আয়োজনে, তা সে যে পুজোই হোক না কেন গঙ্গাজল নির্বিকল্প। আমাদের বর্তমান বিষয় অবশ্য গঙ্গাপুজো নিয়ে নয়। গঙ্গায় পুজো অর্থাৎ গঙ্গানদীকে ঘিরে পূজায়োজনকে নিয়ে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ছট পুজোর কথা। এই পুজোয় মূল উপাস্য সূর্যদেব। প্রথম দিনের পুজোয় পুণ্যার্থীরা গঙ্গাস্নান সেরে গঙ্গাজল নিয়ে আসেন বাড়িতে ও সূর্যের উদ্দেশে তা নিবেদন করেন। পরের দিন উপবাস। এর পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে তাঁরা গঙ্গার ঘাটে যান বিকেলের দিকে এবং অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশে পূজাপাঠ-ভক্তি-অর্চনা ইত্যাদি হয়। এর চতুর্থ দিন অর্থাৎ চূড়ান্ত দিনে পুণ্যার্থীরা একেবারে ভোরে গঙ্গার ঘাটে আসেন এবং আধগলা জলে ডুবিয়ে ভোরের উদিত সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনা ও প্রণাম করেন। চারদিনের ছটপুজোর গোটাটাই জুড়ে রয়েছে গঙ্গা। এছাড়া মহালয়ার ভোরে পিতৃতর্পণের দৃশ্যটিও উল্লেখযোগ্য।

বেনারসে আয়োজিত হয় পাঁচদিনের গঙ্গা-মহোৎসব। হাজার হাজার ভক্ত বছরের নির্দিষ্ট সময় গঙ্গার ঘাটে প্রদীপ জ্বালেন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে এবং অবশ্যই গঙ্গাস্নানও করেন। এছাড়াও জ্যৈষ্ঠে আয়োজিত হয় দশদিনের গঙ্গা-দশেরা উৎসব। এতে বিশেষ আকর্ষণ গঙ্গার মূর্তি নির্মাণ করে তাতে ১০৮টি শাড়ি পরিয়ে মহা ধূমধামে গঙ্গাদেবীর পুজোর্চনা করা। এছাড়া পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগরদ্বীপে গঙ্গা ও সাগর-সঙ্গমে প্রতি বছর আয়োজিত গঙ্গাসাগর মেলার কথা কে না জানে! দূর-দূরান্ত থেকে আসা সাধু-সঙ্গমে ভরে ওঠে গঙ্গাসাগর। 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার।' তবে জীবনের শেষ তীর্থে যাবার আগে গঙ্গাজল মুখে দেওয়ার প্রথা এত আধুনিকীকরণ, বিশ্বায়ন, আগ্রাসী কমিউনিজম আর হঠকারি রাজনীতির ভিড়েও হারিয়ে যায়নি। ■

পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ

কমলাকান্ত বণিক

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন, ধ্বংস ইত্যাদির কর্তারূপে একজন সর্বশক্তিমান আছেন এরূপ বিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের আছে। সকলের নেই। সেই সর্বশক্তিমানকে বিভিন্ন দেশে ও ভাষায় নানা নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতে বলে 'গড', আরবি ভাষায় 'আল্লাহ', আমরা ভারতীয় ভাষায় বলি 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' ইত্যাদি। অবশ্য একথা সত্য যে, সেই সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সকলের ধারণা এক নয়, স্পষ্ট নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয়। এই ঈশ্বর বা ভগবানের কোনো রূপ নেই। কেননা তিনি সর্বব্যাপী, অসীম। অসীমের রূপ থাকতে পারে না।

তবে অনেক হিন্দুর বিশ্বাস ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনো কখনো অংশত পৃথিবীতে রূপ পরিগ্রহ করে জন্ম নেন। এই রূপধারী ঈশ্বরকে হিন্দুগণ 'অবতার' বলে মানেন ও পূজা করেন। অধিকাংশ হিন্দু শ্রীকৃষ্ণকে দেহধারী স্বয়ং ঈশ্বর বলে বিশ্বাস ও পূজা করেন। হিন্দুদের বিভিন্ন শাস্ত্রে অবতারদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্নতা দেখা যায় । তবে বৈষ্ণব কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের তালিকাটিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। তালিকায় দশ অবতারের উল্লেখ আছে বলে অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস'-এর ২৩৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এই দশ অবতারের মধ্যে চার অবতার মনুষ্যরূপী নয়। পরবর্তী ছয় অবতার মনুষ্যরূপী। আশ্চর্যের বিষয়, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বেদবিরোধী ও নাস্তিক মহামতি বুদ্ধদেবকে হিন্দুশাস্ত্রে অবতার হিসেবে উল্লেখ করলেও দশ অবতারের তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের নাম নেই। যদিও তাঁর বৈমাত্রেয় দাদা বলরামের নাম তাতে আছে। এর একটা ব্যাখ্যা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অংশ নন, তিনি স্বয়ংপূর্ণব্রহ্ম।

যাহোক, মহাভারত গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিসতুতোভাই পাণ্ডবদের পক্ষে তৃতীয় পাণ্ডব ও সখা অর্জুনের রথে সারথি হিসেবে কাজ করেছেন। অনেক পণ্ডিতের মতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ খৃস্টের জন্মের ১৪৩০ বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসামান্য গবেষণামূলক গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ তা উল্লেখ করেছেন (৫ম পরিচ্ছেদে)। অতএব মোটামুটি ধারণা, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের মথুরা নগরে যাদবকুলের বৃষ্ণি বংশে বসুদেব ও দৈবকীর সন্তান কৃষ্ণ তাঁর মাতুল অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারে জন্ম নেন এবং আত্মীয় নন্দ গোপ ও তাঁর স্ত্রী যশোদার দ্বারা কিছুটা বড় হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালিত হন। এসব কথা প্রায় সকলেরই জানা।

বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে একাধিক কৃষ্ণ নামধারী ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। তবে বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। কৃষ্ণ বিষয়ক কথা পাওয়া যায় মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদি নয়টি গ্রন্থে। মহাভারতের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও পুরাণাদির নেই। এইসব গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও এখন তাদের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। অনুবাদ ছাড়াও বাংলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে কিছু বই লেখা হয়েছে। বৈষ্ণব কবিগণ কৃষ্ণ বিষয়ে অনেক গীত, কবিতা, কীর্তন রচনা করেছেন। সাহিত্য হিসেবে তাদের মূল্য যতই থাক, মানুষের ভাবুকতাকে যতই উদ্দীপ্ত করুক সেগুলিকে ইতিহাস বলে গণ্য করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সাধারণত আমরা শ্রীকৃষ্ণকে যে রাধা ছাড়া ভাবতে পারি না সেই রাধা নামে কোনো যুবতীর অস্তিত্ব মহাভারতে বা ভাগবতের কোথাও নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে।

ভাগবতে রাধানাম না থাকলেও কৃষ্ণ গোপ বালাদের সঙ্গে প্রেমলীলা করেছেন তার উল্লেখ আছে। এসব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' করেছেন। এবং যা বলেছেন তা যুক্তিপূর্ণ ও সত্য বলেই ধরা যায়। 'রাধা' একটি রূপক বা তত্ত্ব যা পুরাণকারদের সৃষ্টি। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে এ নিয়ে বিশদ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার আছে। কৌতূহলী ব্যক্তি পড়লে বুঝবেন। 'রাধা' কবির কল্পনা। এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। কৃষ্ণকে নিয়ে বাংলা গদ্যে (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নয়) তিনটি বই পড়েছি। কোথাও রাধা নেই। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গজেন্দ্র কুমার মিত্র 'পাঞ্চজন্য' কৃষ্ণ ভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন। সেখানে রাধার উপস্থিতি নেই বলেই মনে পড়ে। কৃষ্ণ বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। সেখানে রাধা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কিন্তু অস্তিত্বের স্বীকৃতি নেই।

যাহোক, কৃষ্ণকে নিয়ে বিচার করার শ্রেষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক ভিত্তি মহাভারত। এই মহাভারতে প্রথমে কৃষ্ণকে পাই রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংম্বর সভায়। তিনি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হিসেবে নয়, দর্শক হিসেবে এসেছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে। তখন তিনি পরিপূর্ণ যুবক। মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর কালের বৃত্তান্ত নেই। সেসব ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণাদিতে আছে। কৃষ্ণ বিষয়ক যত কাহিনি আছে তন্মধ্যে মহাভারত সর্বপ্রাচীন। মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, অসাধারণ তীক্ষ্ণধী, নিপুণ রাজনীতিবিদ, রণকুশল সেনাপতি, বলশালী যোদ্ধা, মানবহিতৈষী সমাজতত্ত্ববিদ ও আদর্শ মানুষ। মহাভারতের কৃষ্ণ ও ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি কিনা তা বিতর্কিত। আমরা যে কৃষ্ণকে পূজা করি, ইতিহাস বলে গণ্য করা যায় না এমন প্রাচীন নানা গ্রন্থের অস্পষ্টতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি দ্বারা তাঁকে একই ব্যক্তি বলে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না। গবেষক লেখক অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস' এর ২৩১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'বাসুদেব কৃষ্ণ এক ও অবিমিশ্র চরিত্র নয়। মূল ব্যক্তিটি তিনি, যাঁর কীর্তিকলাপের পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। যাদব ট্রাইবের এই অন্যতম প্রধান ব্যক্তিটি যাঁকে মহাভারতের কয়েক স্থানে সঙ্ঘ-মুখ্য বলা হয়েছে, তৎকালীন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারত থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যাদবদেরই একটি অন্তর্বিপ্লবের ফলে তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা নিহত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হন। এই অন্তর্বিপ্লবের কাহিনি, যার ফলে সমস্ত বৃষ্ণিকুল ধ্বংস হয়েছিল, শুধু মহাভারতেই নেই, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এ কাহিনির উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ ঘটজাতকেও অন্তর্বিপ্লবের ফলে বাসুদেব কৃষ্ণের নিহত হবার খবর আছে।

এই মূল চরিত্রটি দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হবার পর আরও দু'টি চরিত্র তাঁর উপর আরোপিত হয়। একটি হচ্ছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ দেবকীপুত্র যিনি ছিলেন ঘোর-আঙ্গিরসের শিষ্য। বাসুদেব কৃষ্ণের মাতার নামের সঙ্গে এঁর মাতার নামের অভিন্নতা এর একটা বড় কারণ। দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র যা বাসুদেব কৃষ্ণের উপর আরোপিত হয়েছিল তা ছিল পশ্চিম ভারতের এক পশুপালক দেবতার, যাঁর বিকাশ হয়েছিল সম্ভবত আভীর ট্রাইবদের মধ্যে। পরবর্তীকালের সাহিত্যে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার যে সকল কাহিনি পাওয়া যায় তা আসলে এই পশুপালক দেবতাটিকে ঘিরেই হয়তো গড়ে উঠেছিল।" কিন্তু সাধারণ মানুষ তো এতসব কথা জানে না। জানার কথাও নয়। কেননা সাড়ে তিন হাজার বছর আগের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইংরেজ শাসন আমলে এসে হিন্দুরা ইতিহাস লেখায় কিছুটা এগিয়ে এসেছেন। নয়তো এর আগে তাঁরা কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়েই চর্চা করেছেন, ইতিহাস নিয়ে নয়। অতএব যেভাবেই হোক কৃষ্ণ হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু সেই কৃষ্ণ বংশীধারী ও গোপীজনবল্লভ না হয়ে দুষ্কৃতী বিনাশকারী সুদর্শনধারী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়ক কৃষ্ণ হওয়াই উচিত ও মঙ্গলজনক।

এখানে আপাতদৃষ্টিতে বিষয়ান্তর মনে হলেও মূলত প্রাসঙ্গিক বলেই বলছি, প্রজ্ঞাবান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ যেভাবে ধর্ম বা ঈশ্বর ইত্যাদি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন বা করেন এবং ব্যক্ত করেন ও প্রচারিত হয় সেসবের মধ্যে কী সার্বিক ঐক্য থাকে কিংবা সেসব কি প্রকৃতই যৌক্তিক, নির্ভুল? সেইসব উপলব্ধ, ব্যক্ত ও প্রচারিত কথাগুলি বিভিন্ন স্তরের আমজনতার কাছে কি সেভাবেই পৌঁছায় এবং বোধ্য ও অনুসৃত হয়? বিপুল জনতার অধিকাংশ লোক, যাদের আমরা রামা-শ্যামা, পদী-পিসী, ক্ষ্যান্ত মাসি বলি তারা যা পুরুষানুক্রমে অন্ধের মতো বিশ্বাস ও অনুসরণ করে তার সঙ্গে প্রকৃত সত্য ও জ্ঞানের সর্বাংশে কোনো সম্বন্ধ থাকে না, থাকা সম্ভবত নয়। সুতরাং আগে বা সম্ভবত পরেও অন্ধ বিশ্বাসের বাইরে সকলের যাওয়ার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। অথচ এ নিয়েই তো এতকাল চলে আসছে। অযৌক্তিক আচার-অনুষ্ঠান, ছুতমার্গ, হাঁচি-টিকটিকি, মানুষের বর্ণভেদ, গোপী-বস্ত্র হরণ ইত্যাদি হাজারো সংস্কার এর প্রমাণ।

সাধারণ লোক ঈশ্বরকে যেভাবে বোঝেন ঠিক সেভাবেই মন বুদ্ধি, চিন্তা ইত্যাদির অধিকারী ইচ্ছাময় কোনো দেহহীন অনন্ত শক্তির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কিনা বা আছে কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও আমরা যেভাবে অবতারের ব্যাখ্যা করি তা যথার্থ কিনা তাও বিতর্কিত। অতএব ওই জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে কৃষ্ণ সম্পর্কেই আলোচনা করলে আমাদের কাজটা সহজ হয়। আমরা পুরাণাদি ও বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত কৃষ্ণের আলোচনা বাদ দিয়ে মহাভারতের কৃষ্ণকে নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তবে এখানে একথাও উল্লেখ করবো যে, বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত একজনের রচিত নয়। মহাভারতে পরবর্তীকালে অনেকের রচনা প্রক্ষিপ্ত হয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত মহাভারতে কৃষ্ণ বিষয়ে যে সকল কথা আছে তার সবটুকু বিশ্বাস্য নয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য ছাড়াও বহু বিদেশি বিখ্যাত পণ্ডিতের প্রচুর গ্রন্থ থেকে কঠোর পরিশ্রম করে 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ গভীর পর্যবেক্ষণ, অকাট্য যুক্তি দিয়ে ১৭৬ পৃষ্ঠার বইটিতে অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে চিত্রিত করেছেন। কৃষ্ণকে হিন্দুগণ প্রায়

সকলেই এবং বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ভগবান বলে মেনেও তিনি তাঁর লেখায় কোথাও কৃষ্ণের অলৌকিককতা বা অমানুষী কোনো কর্মকে স্বীকার করেননি। তিনি একমাত্র এটাই বলতে চেয়েছেন, অবতারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুষ্কৃতীর বিনাশ দ্বারা সৎ মানুষের পরিত্রাণ করা এবং অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষের জন্য আদর্শ স্থাপন করা। যদি অবতার অলৌকিক বা দৈব শক্তির সাহায্যে এসব করেন তবে সাধারণ মানুষের তা অনুসরণযোগ্য আদর্শ হতে পারে না। এবং সেজন্য তিনি কৃষ্ণকে সকলের অনুসরণযোগ্য আদর্শ মানুষ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারী হয়ে কৃষ্ণালোচনা করবো।

ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদি এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপবালা ও রাধা নাম্নী যুবতীর প্রেমলীলা রূপক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাইহোক তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তারা ওই জটিল ব্যাখ্যা বোঝে না। বরং বর্ণিত ঘটনাগুলোর বাস্তব দিক তাদের ভাবাবেগকে উসকে দিয়ে বিপথগামী করে। ফলে সেসব বর্ণনা সমাজকে নির্মল ও শক্তিশালী করে কল্যাণের পথে নিতে পারে না। সাধারণ মানুষ তাদের পরিবেশ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি, দৈহিক ও মানসিক ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সংসারের প্রাত্যহিক দায়িত্ব পালন করে মাত্র। এর বাইরে জ্ঞানচর্চার সময়, ক্ষমতা বা রুচির কোনোটাই তাদের থাকে না। ধর্ম ব্যবসায়ী কথক ঠাকুরদের মুখে যে সকল শাস্ত্র ও তার ব্যাখ্যা তারা শোনে তাতে তাদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। অজ্ঞানতা বাড়তেই থাকে। জ্ঞানের খোঁজ পায় না। তার অনুসন্ধান করার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কোনোটাই তাদের অধিকাংশের নেই। জ্ঞানী ও মনস্বী ব্যক্তিগণ যেসব কথা লেখেন বা বলেন তা সমাজের অত্যন্ত সীমিত গুটিকয় ব্যক্তি চর্চা করেন এবং সেখানেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবিক পক্ষে আমজনতার মধ্যে এসব ছড়াতে পারে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকৃত সত্য ও নির্মল জ্ঞান ছড়ানোর কঠিন কাজটি করবে কে? এটা বাস্তব সত্য যে, সংসারের স্বার্থান্বেষী ও মতলববাজ মানুষেরা এই কঠিন কাজটি করার উৎসাহ বোধ করে না বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করে না। সুতরাং যুগ যুগ ধরে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার অবিচল হয়েই থাকে। এর থেকে সমাজকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আর এক বিষয় হচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ চায় না সমাজ উন্নত হোক, সংস্কারিত হোক। তাহলে উপায়? অবশ্যই উপায় আছে। কিন্তু তা খুবই দুঃসাধ্য। যারা সমাজকে, দেশকে ভালবাসেন তাঁর যদি কোনো শক্তিশালী, পরার্থপর ও উপযুক্ত নেতা কর্তৃক সংগঠিত হয়ে সাধারণ মানুষের নৈতিকতা ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে দৃঢ়চিত্ত হয়ে অগ্রণী হন তবেই তা সম্ভব। আমরা বহুকাল যাবৎ যে সকল বাহ্যিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিনা প্রশ্নে পালন করে আসছি তাতে প্রকৃতই কোনো সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ হচ্ছে কিনা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। এইসব ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় অভ্যস্ত অনুসরণের মধ্যে অনেকের মনেই পুণ্য অর্জন ও স্বর্গলাভের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু সেগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্নের উদয় হয় না বলেই ধরা যায়। এবং এসব অনুসৃত আনুষ্ঠানিকতার ও কল্পিত পুণ্যার্জনের দ্বারা স্বর্গলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার চেয়ে আমাদের ইহজাগতিক সামাজিক কল্যাণের ইচ্ছা ও চেষ্টা অনেক মহৎ ও বাস্তব বিষয়, সেটা ক'জন চিন্তা করে? বিশেষ একটি দিনে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব যদি কেবল আমাদের অনুষ্ঠানেই শেষ হয় তবে তার সার্থকতা নেই, একথাটা আমাদের সকলকে বুঝতে হবে। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের নৈতিকতা, আদর্শ ও কর্মকে আমাদের প্রতিদিনের কাজে অনুসরণ করি তবেই আমাদের কৃষ্ণভক্তির সার্থকতা ও সমাজের মঙ্গল। পয়সা খরচ করে স্বল্প শিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ী কথকঠাকুরকে দিয়ে সাধারণের অবোধ্য শাস্ত্রপাঠ করানো ও প্রসাদ বিতরণের মধ্যে সত্যই কি সমাজের কোনো মঙ্গল সাধিত হয়? বরং একটা বিশেষ দিনের উপলক্ষ্যে আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তিদের রচনা সামাজিকভাবে যাতে গুরুত্ব-সহ চর্চা করা হয় তাতেই সমাজের মানসিকতার উন্নয়ন ও কল্যাণ হবে।

ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্রে বর্ণিত কৃষ্ণের বহুল প্রচলিত ননিচুরি, রাসলীলা, গোপীদের বস্ত্রহরণ প্রভৃতির বর্ণনায় ধর্মব্যবসায়ী কিছু লোকের অর্থোপার্জন হয় ঠিকই; কিন্তু যারা শোনে তাদের কোনো পুণ্যার্জন হয় না, আত্মিক কোনো উন্নতিও হয় না। সামাজিক মঙ্গল তো দূরের কথা। এই সত্য কথাটা স্পষ্ট করে সকলকে বোঝাতে হবে। কাজেই ভাগবত ইত্যাদির বংশীধারী প্রেমলীলার কৃষ্ণ নয়, মহাভারতের আদর্শ পুরুষ সুদর্শনধারী কৃষ্ণের চর্চা করার মধ্যেই আমাদের সঙ্কট মুক্তির উপায় আছে। শ্রীকৃষ্ণ মহা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এবং তার যুগের কংস, জরাসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বিনাশ সাধন করে ভারতবর্ষে একটা সার্বভৌম শক্তিশালী ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি ন্যায়পরায়ণ পাণ্ডবদের দ্বারা সফলতা অর্জন করেছিলেন। যদিও তা ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কর্মকাণ্ডে কোনো ব্যবস্থাই চিরকালের হয় না। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই হোক ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন ধ্বংস-সৃষ্টি এক অনিবার্য নিয়ম।

রাজনীতি এখনও আছে। রাজনীতিকদেরও অভাব নেই। কিন্তু তাদের লক্ষ্য কৃষ্ণের আদর্শের বিপরীতে। ভোটের রাজনীতিতে এখন কোনো উচ্চ আদর্শ নেই। আছে গদি দখলের নোংরামি। জাতি দেশ আজ ধর্মীয় সন্ত্রাসের মুখে সঙ্কটাপন্ন। প্ল্যানমাফিক কিছু মৌলবাদী ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসী দেশের বিভিন্ন অংশে ধ্বংসাত্মক কাজ করে চলছে। এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অনেক মতলবাজ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী নামধারী জাতির শত্রু এসব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করছে না। এই বিষয়টাকে আমরা যেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবি এবং সতর্ক হই। না হলে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে আমরা বিপদগ্রস্ত হবই। আমাদের কৃষ্ণচর্চা যেন আমাদেরকে দেশ রক্ষা ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করে। তাহলেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি সার্থক হয়।

ভয় সর্বদাই মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল মানুষ আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষায় অসমর্থ। অত্যাচারীকে তোষণের দ্বারা নিবৃত্ত করা যায় না। শক্তি দ্বারাই তাকে মোকাবিলা করতে হবে। আমরা যেন ভয়হীন ও শক্তিমান হই। বংশীধারী কৃষ্ণ নয়, কুরুক্ষেত্রের নায়ক সুদর্শনধারী কৃষ্ণের সেটাই উপদেশ। তিনিই হিন্দুজাতির আদর্শ। ■

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল

শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসেবে মনে করা হয়। অধর্মকে বিনাশ করে তিনি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের আসনে বসিয়েছে। তাঁর মুখনিঃসৃত গীতা অনন্তকাল ধরে মানুষকে সুন্দর জীবন গঠনের পথ দেখিয়ে আসছে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে তিনি আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মথুরায়। সেই সময় মথুরার রাজা ছিল অত্যাচারী কংস। কংস তার বাবা উগ্রসেনকে হত্যা করে রাজা হয়েছিল। প্রজাদের উপর সে নানা উৎপীড়ন চালাত। তাই প্রজারা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো। একদিন দৈববাণী হলো— বোন দেবকীর অষ্টম পুত্রের হাতে কংসের বিনাশ হবে। এই দৈববাণী শুনে কংস খুব ভয় পেয়ে গেল এবং বোন দেবকী ও তার স্বামী বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করলো। শুরু হলো দেবকী ও বসুদেবের কষ্টের জীবন। কারাগারে তাদের হাতে পায়ে শিকলের বেড়ি পরিয়ে রাখা হোত।

এই অবস্থাতেই তাঁদের এক সন্তানের জন্ম হলো। কংসের কাছে সেই খবর পৌঁছে যেত। কংস এসে সদ্য জন্মানো শিশুটিকে হত্যা করতো। তারপর তাদের যত সন্তান জন্মালো কংস একইভাবে সবাইকে হত্যা করলো। দেবকী বসুদেব কিছু করতে পারতো না। তাঁরা শুধু কাঁদতো আর ভগবানকে ডাকতো।

একবার ঝড়-ঝঞ্ঝার রাতে তাদের অষ্টমপুত্রের জন্ম হলো। কারাগারের বাইরে তখন প্রকৃতির প্রলয় চলছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। কারাগারের রক্ষীরা সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই দুর্যোগের দিনে বসুদেব এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। তিনি তাঁর সদ্য জন্মানো সন্তানকে নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন কারাগারের বাইরে। রাতের মধ্যেই কোনো নিরাপদ জায়গায় সন্তানকে পৌঁছে দিতে হবে।

মথুরা রাজ্য দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদী। বসুদেব যমুনার তীরে এসে দাঁড়ালেন। জলের বেগে যমুনা তখন উথাল পাথাল। এই নদী পেরোনো কারো সাধ্য নেই। কিন্তু বসুদেব ভয় পেলেন না, নেমে পড়লেন যমুনার জলে। যমুনা পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছলেন বৃন্দাবনে। উঠলেন তাঁর বন্ধু নন্দরাজের ঘরে। নন্দরাজ ছিলেন গোপালক সম্প্রদায়ের প্রধান। বসুদেব তাঁর সন্তানকে বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে আবার কারাগারে ফিরে গেলেন।

নন্দরাজ ও যশোদার ঘরে বড় হতে লাগলো সেই শিশু। নাম হলো কৃষ্ণ। এছাড়াও আরোও অনেক নাম হলো তাঁর— গোপাল, গোবিন্দ, কানাই।

গোকুলে সবার প্রিয় হয়ে উঠলো গোপাল। তারপর বড় হয়ে মথুরায় গিয়ে অত্যাচারী মামা কংসকে বধ করলেন এবং মথুরার রাজা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসালেন। কৃষ্ণের নামে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

রাজ্য পরিচিতি

মেঘালয়

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য মেঘালয়। ১৯৭২ সালে জন্ম হওয়া এই রাজ্যের উত্তর-পূর্বে অসম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশ। উত্তর-পূর্ব ভারতের যে সাতটি রাজ্যকে একসঙ্গে সেভেন সিস্টার বলা হয় তার মধ্যে মেঘালয় একটি। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং।

বহু জনগোষ্ঠীর বাস এই রাজ্যে। গারো, খাসি, হাজং ছাড়াও বহু বাঙালির বাস এখানে। এদের প্রত্যেকের ভাষাও আলাদা আলাদা। এখানকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার। আয়তন ২২ হাজার ৪৩৯ বর্গ কিলোমিটার। মেঘালয় একটি বৃষ্টিবহুল রাজ্য। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল স্থান চেরাপুঞ্জি এখানেই।

এসো সংস্কৃত শিখি

তথৈব আস্তু!
আজ্ঞে হ্যাঁ (তাই হোক)।

জানামি।
জানি।

আম্, তত্ সত্যম্।
হ্যাঁ, ওটাই ঠিক আছে।

সমীচীনা সুচনা।
ভালো খবর।

স্বল্পম্ এব।
একটু/খুবই কম।

ভালো কথা

স্বাধীনতা দিবস পালন

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করলাম। পাড়াতে ও স্কুলে, দুই জায়গাতেই করেছি। পাড়াতে বড় দাদাদের সঙ্গে আমরা পতাকা তোলার আয়োজন করি। ফুল রঙ দিয়ে খুব সুন্দর করে সেই জায়গাটি সাজাই। প্রথমে জাতীয় পতাকা তোলা হয়। পতাকা তোলেন আমাদের পাড়ার পুজো কমিটির সভাপতি। তারপর সবাই একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা বলেন তিনি। সবশেষে আমাদেরকে চকোলেট খাওয়ানো হয়। স্কুলেও মাস্টারমশাইরা বক্তব্য রাখেন, অনেকে দেশাত্মবোধক গান করে।

শুভম পাল, সপ্তম শ্রেণী, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

ছুটির সুর

রাজ সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণী

বাজলো ছুটির সুর
পূজা নয় খুব দূর।
আকাশ বাতাস আজ
সাজছে পূজার সাজ।

সবাই মনে মনে
পূজার দিন গোনে।
আর কত দিন বাদে
পড়বে কাঠি ঢাকে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

মহিলাদের নিরাপত্তায় রাতের মহিলা সারথি

অঙ্গনা

রিনি রায়

বর্তমানে আমাদের দেশে 'উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট' বা নারী ক্ষমতায়ন শব্দ জোড়াটির খুব চল হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের পাতায়, পর্দায়, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে '#' (হ্যাশ) ট্যাগের সংস্পর্শে এই শব্দযুগলটির বহুল ব্যবহার নারী সমাজের হাজারো না-পাওয়ার মাঝে খানিকটা হলেও 'সব পেয়েছি'-র আবেশ অনুভূত হয়। আমাদের এই বৃহৎ দেশের বৃহৎ নারী

সমাজের পাওয়া- না-পাওয়ার হিসাব বেশ জটিল। নারী কোথাও ক্ষমতার শীর্ষে, কোথাও আবার তার স্বাধীনভাবে চলাফেরার স্বাধীনতাটুকুও নেই। কিন্তু তবুও নারী পথে নামে, ঝুঁকির পথে পা বাড়ায়। সাহসভরে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ পুরুষকেন্দ্রিক পেশাজগতে। সেই তালিকায় বিমান চালনা, যুদ্ধবিমান চালানো, পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে যোগদান এরকম মহাগুরুত্বপূর্ণ পেশা থেকে শুরু করে ট্রেন চালনা, ট্যাক্সি চালনার মতো পেশাগুলিও আছে।

বর্তমান ভারতে আইন শৃঙ্খলাজনিত কারণে মহিলারা রাতের রাস্তায় বের হতে ভয় পান। যদি কখনও বহুজাতিক সংস্থার মহিলা কর্মীদের একটু বেশি রাতের শিফটিং ডিউটি থাকে, তবে তাদের সঙ্গে থাকে অফিসেরই দেওয়া গাড়ি, কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তিগত গাড়িও থাকে। কিন্তু পেশার তাগিদে ২৪ ঘণ্টাই শিপটিং ডিউটি! তাও আবার চার দেওয়ালের ঘেরাটোপের বাইরে রাতের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে! এ ভাবা সত্যিই কষ্ট। তবুও এই ভাবনাকে বাস্তব করেছেন গোয়ার বেশ কিছু মহিলা যারা পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন রাতে ট্যাক্সি চালনা। ২০১৪-র ১৭ অক্টোবর গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পার্রিকর রাতে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন। প্রথমে মাত্র ১৫ জন মহিলাকে এই পদে নিযুক্ত করা হলেও এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। রেকর্ড সৃষ্টি করার টানে নয়— সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার কারণে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে অথবা কেউ নিজের উচ্চশিক্ষার খরচ নিজেই জোগাড় করতে, কেউবা আবার নেহাতই 'প্যাশন'-এর কারণে এই পেশাকে বেছে নিয়েছেন। ড্রাইভিং-য়ের পাশাপাশি নিজ সুরক্ষার জন্য হাত পাকিয়েছেন আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ে। যেমন— জুডো, ক্যারাটে, কুংফুতে। তাই নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও সাহসের ওপর ভর করে নির্দ্বিধায় দাপটের সঙ্গে সারারাত ধরে মহিলা তথা বিদেশি মহিলা পর্যটকদের পরিষেবা দিচ্ছেন। তবে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য এই ট্যাক্সি হলেও পুরুষরাও মহিলা যাত্রী-সহ এর সওয়ারি হতে পারেন। বেকারত্বের জ্বালা যেখানে ক্রমবর্ধমান সেখানে এ পেশা স্বল্প হলেও মহিলাদের মধ্যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বহন করে আনছে। তবে শুধু গোয়া নয়— দিল্লী, মুম্বই, জয়পুরের মহিলারাও এ পেশায় এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মহিলাদের সদিচ্ছার পাশাপাশি প্রধানত যে বিষয়টির খেয়াল রাখা প্রয়োজন, তাহলো সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সরকার তথা প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকা। তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটেও এ দৃশ্য দেখা যাবে তা আশা করাই যায়। তাই সদর্থক আশায় বুক বেঁধে এ স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে। হয়তো এই স্বপ্নই ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের এ পথে আসতে প্রেরণা যোগাবে। ■

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন

অতিথি কলম

মেধা শ্রীবাস্তব, যশোস্বিনী মিত্তাল

গত সপ্তাহে সমাপ্ত হওয়া সংসদের উভয় কক্ষের এমন ফলপ্রসূ অধিবেশন বহুকাল অনুষ্ঠিত হয়নি। অবিঘ্নিত এই অধিবেশনে অনুমোদিত হয়ে গেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জি এস টি-র মতো বিল এবং সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিলও। বিগত দশ বছরের মধ্যে এমন আক্ষরিক অর্থে উৎপাদনক্ষম সংসদের অধিবেশন আর দেখা যায়নি। সেদিক থেকে এটি একটি রেকর্ড। আমরা এখন সংসদের অধিবেশন হৈ-হট্টগোল করে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। দীর্ঘ সময় ধরে মুলতুবি হয়ে যাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের মূল বিষয়টিই সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা Vidhi Centre for Legal Policy-র তরফে 'Disruption in Indian Parliament' শীর্ষক একটি সমীক্ষা চালাতে সংসদের আলটপকা দু'টি অধিবেশনকে

> “প্রতিবাদ করা বিরোধিতা প্রদর্শনের অবশ্যই সেরা আইনসিদ্ধ পথ কিন্তু প্রতিবাদের নামে সংসদকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আদৌ চলতে না দেওয়া প্রতিবাদের অস্ত্রের অপব্যবহার মাত্র।”

বেছে নিই। একটি ছিল ২০১৩-১৪-র ইউপিএ আমলের শীতকালীন অধিবেশন এবং এনডিএ আমলের ২০১৫ সালের বর্ষাকালীন অধিবেশন। অধিবেশন দু'টির কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে নানা তথ্য উঠে এসেছে।

উল্লেখযোগ্য হলো উভয় অধিবেশনেরই সময়সীমার সত্তর শতাংশ সময় নষ্ট হয়েছে বাধা সৃষ্টিতে বা অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়ার প্রচেষ্টায়। আবার পড়ে থাকা ৩০ শতাংশ সময়ের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশই ব্যবহৃত হয়েছে আইন সংক্রান্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে। অবশিষ্ট ২৪ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে নানান সমসাময়িক বিষয়ের চর্চায়। যেমন মার্কিন দেশে অবস্থিত ভারতের কনসাল জেনারেলের সঙ্গে সেদেশের দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গে বা ভূতপূর্ব ক্রীড়াকর্তা ললিত মোদীর বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্রের বৈধতা নিয়ে। দেখা যাচ্ছে সংসদের কাছে দেশের পক্ষে লাভজনক কিছু করার সময় অতি দুর্লভ। আবার যখনও বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সংসদ লিপ্ত হয় সেটিও সচরাচর তার প্রাথমিক যে কাজ অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সেগুলি এজেন্ডায় থাকে না।

বহু কাঠামোগত ত্রুটি ও বাস্তব বিষয়ই অনেক সময়ে সভার কাজে বিঘ্ন ঘটানোকে উৎসাহিত করে। বিতর্ক চলাকালীন বহু বিরোধী সাংসদই মনে করেন তিনি মতামত পেশ করার প্রাপ্য সুযোগ পেলেন না। পারলেন না তাঁর কাঙ্ক্ষিত নীতিগত বিষয়টি উত্থাপন করতে। এরই ফলস্বরূপ অনেক সময়ই নজর কাড়তে বা অবহেলিত হওয়ার বোধ থেকে উঠে আসে পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত বাধাদান। শাসকদল যাতে এর অভিঘাত টের পায় এটিই লক্ষ্য। এই ধরনের বাধা সৃষ্টির সহায়ক হয় সংসদীয় কার্যক্রম চালাবার মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি।

প্রসঙ্গত 'শূন্য ঘণ্টার' (জিরো আওয়ার) জন্য যে সময় বরাদ্দ করা থাকে তা অবশ্যই সব সদস্যের বলার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এর মধ্যে বিরোধী দলের সাংসদরাও আছেন যাঁদের হয়তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চর্চা করার পরিকল্পনা ছিল। আলোচ্য সংসদ অধিবেশনের শীতকালীন পর্যায়ে 'শূন্য ঘণ্টায়' ১২৭টি বিষয় ও বর্ষাকালীন পর্যায়ে ২৫৩টি বিষয় তোলা হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই সদস্যরা অধিবেশন বানচাল করার পথ বেছে নেয় কেননা বিষয়গুলি আলোচনার জন্য চিহ্নিত সময়ে যথাযথভাবে আলোচিত হতে পারেনি। আমাদের মনে হয়েছে আজকের পরিস্থিতিতে এই 'শূন্য ঘণ্টার' বিষয়টা ঘষামাজা করার দরকার আছে। 'বিরোধী সোমবার' হিসেবে এমন একটা দিন নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে যেদিন কেবলমাত্র বিরোধীদের নেতৃত্বেই প্রশাসন পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলি নিয়ে তুল্যমূল্য আলোচনা, বিতর্ক চলবে।

এই ধরনের পদ্ধতি মোটেই নতুন নয়। বৃটেনের সংসদে শেষ পঙ্‌ক্তিতে বসা তুলনায় নবীন দলের সদস্যরাই তাঁদের নিজেদের বেছে নেওয়া কোনো বিষয় নিয়ে একদিন আলোচনা চালাতে পারেন। অন্যদিকে মার্কিন সংসদে বিতর্কের সময় নির্দিষ্টভাবে সেখানকার সভা পরিচালনার রীতি অনুযায়ী বিষয়ের প্রস্তাবক বা স্বপক্ষে ও বিরোধীদের মধ্যে বিভাজিত করে দেওয়া আছে।

অপরদিকে জার্মানির আইনসভায়

(Bundestag) সব রকমের বিচিত্র বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপনের ভার মূলত দেওয়া আছে ছোট ছোট সংখ্যালঘু দলগুলির ওপর। এটি একান্তই তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত। প্রচলিত নিয়মের ছোট্ট একটু অদল বদল করে নিলেই কিন্তু অনায়াসে সকলের (সাংসদদের) মধ্যেই একটা স্বাধিকারবোধ জন্ম নিতে পারে। সুফল হিসেবে যখন তখন সভা ভণ্ডুল করার প্রবণতা নিশ্চিতভাবে কমতে পারে, কেননা এতে সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, কালক্রমে কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যেই সংসদের যাবতীয় কাজকর্মের অভিমুখ নির্দিষ্ট থাকছে। আমরা বলতে চাইছি সেই দলের সদস্যের ব্যক্তিগত কোনো পরিচয়ের কোনো গুরুত্বই থাকছে না। সবই দল ঠিক করে দিচ্ছে। কারণে অকারণে হুইপ জারি করা যে কোনো সাধারণ বিষয় নিয়ে ভোটাভুটির ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি দলের কর্ত্রী হুইপ অমান্য করায় এক সাংসদকে দল থেকে বিতাড়িত করেছেন। তিনি নাকি দলবিরোধী কাজে অভিযুক্ত। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা গেছে যখনই কোনো রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে সংসদ অচল করার কর্মসূচি নেয় তখন ব্যক্তি সাংসদকে তা মানতেই হবে যাতে হট্টগোলের তীব্রতা কম না হয়। উদাহরণ হিসেবে ২-জি কেলেঙ্কারি রিপোর্ট নিয়ে ২০১৩ সালে বিজেপি সদস্যদের শোরগোল আবার ২০১৫-এর বর্ষাকালীন অধিবেশনে কংগ্রেসের সরকার-বিরোধী স্লোগান ও সভা বানচাল একই চরিত্রের। পূর্বপরিকল্পিত। প্রতিবাদ করা বিরোধিতা প্রদর্শনের অবশ্যই সেরা আইনসিদ্ধ পথ কিন্তু প্রতিবাদের নামে সংসদকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আদৌ চলতে না দেওয়া প্রতিবাদের অস্ত্রের অপব্যবহার মাত্র। এই প্রসঙ্গে পার্টি হুইপ-কে কেবলমাত্র অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারলে দৈনন্দিন সভা বানচাল করার প্রক্রিয়া ও রাস্তাঘাটের মতো চীৎকার চেঁচামেচি থেকে সংসদকে বাঁচানো যেতে পারে।

তৃতীয় আর একটি বিষয় হলো প্রধানমন্ত্রীর সংসদে উপস্থিত থাকা। দেখা গেছে যখন সংসদে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন তখন সভা সাধারণত বানচাল হয় না। সাংসদদের গরিষ্ঠাংশই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন— ক্রিকেটের (বি সি সি আই চিফ) প্রধানকর্তার বিদেশ গমন সংক্রান্ত কাগজপত্র দেওয়া বা তামিল মৎস্যজীবীদের শ্রীলঙ্কা সরকারের আটক করার ক্ষেত্রে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনতেই উদগ্রীব ছিলেন।

কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর নির্দিষ্ট কোনো দিনে আবশ্যিকভাবে সংসদে হাজির থাকার লিখিত বাধ্যবাধকতা বা প্রচলিত রীতি নেই তাই প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বা তাঁর উপস্থিতিতে বক্তব্য পেশ করার দাবিতে প্রায়শই বিরোধীরা সংসদ অচল করেন। এক্ষেত্রেও বৃটিশ সংসদে প্রতি বুধবার নিয়ম করে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী হাউস অফ কমন্সে হাজির থাকেন। এমন একটি প্রথা আমাদের এখানে চালু করলে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি ও সংসদ বানচাল করার সম্ভাবনা কমানো যায় বলে মনে হয়।

বিষয়টা যে একেবারেই অসম্ভব নয় তা বর্ষাকালীন অধিবেশনের নিরুপদ্রব চলা ও জাতীয় গুরুত্বের বিলগুলির মসৃণভাবে অনুমোদিত হওয়া থেকে অবশ্যই বোঝা যায়। তাই সংসদের এই বর্ষাকালীন অধিবেশনটি ব্যতিক্রমী না হয়ে এই ভাবেই যাতে ভবিষ্যতে অবিঘ্নিত অধিবেশন চালানো যায় সেক্ষেত্রে আলোচিত কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে। এর ফলে দীর্ঘ আলোচিত জিএসটি-র মতো বিতর্কিত বিষয়ও যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতে পারবে তেমনি প্রায় অনালোচিত শ্রীলঙ্কার কবলে পড়া ভারতীয় মৎস্যজীবীদের বিষয়ও উঠে আসবে। বোঝা যাবে সব বিষয় ও সকল ভারতীয়ের সমস্যার ক্ষেত্রেই সরকার সংসদের সময় যথাবিহিত ভাবে বণ্টন করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম।

(লেখকদ্বয় বিধি সেন্টার ফর লিগ্যাল পলিসি-র রিসার্চ ফেলো)

কর্নিয়া অন্ধত্বমুক্ত ভারত অভিযান

সক্ষম-এর উদ্যোগে জনজাগরণ যাত্রা
আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬,
সময় দুপুর ২টা
স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃকবাড়ি থেকে
শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত।
।। সবারে করি আহ্বান।।

আহ্বায়ক—ডাঃ সনৎ রায়
মোবাইল নং-৯৮৩১৩৯৬৯৬৬

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বিচ্ছিন্নতা না স্বাধীনতা ?

সুদীপ্ত কর

১৬ আগস্ট, ১৯৪৬। কলকাতার রাজপথে হিন্দুদের মৃতদেহ।

''বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।''

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা-সহ অকাল রাখিবন্ধন উৎসব করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ঘটনা এনে দিয়েছিল অদম্য প্রতিরোধ। বিচ্ছিন্নতাকে লক্ষ্য করে কার্জন বঙ্গভঙ্গের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে বঙ্গবাসী তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। তাতে স্ফুলিঙ্গ যোগ করেন রবীন্দ্রনাথ। তাই ইংরেজদের প্রশাসনিক কারণে বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের পবিত্রকেন্দ্র বাংলাকে ভাগ করার পিছনে ছিল স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তাতে ঘুণ ধরানো। কিন্তু বঙ্গবাসীর সম্মিলিত প্রতিবাদের কাছে মাথা নত করে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয় ইংরেজ সরকার। তাই বিচ্ছিন্নতা আপাতত স্তব্ধ করলেও ইংরেজদের লক্ষ্যই ছিল বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তা প্রসারিত করা।

ইংরেজদের উৎসাহ ও প্রেরণার শক্তিকে হাতিয়ার করে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর সলিমুল্লার নেতৃত্বে তৈরি হলো মুসলিম লীগ। আগা খাঁ হলেন সভাপতি আর 'লাল ইস্তেহার' হয়ে উঠল বিচ্ছিন্নতা তৈরির বিষ। কিন্তু ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলিম লীগ ধাক্কা খেল। তখনই ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু কংগ্রেস তখন ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী করার ব্যাপারে তাদের প্রয়াস প্রায় ছিলই না। এর মধ্যে ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। তুরস্ক ছিল ইংরেজবিরোধী জার্মানির সঙ্গে। ফলে এই সময়ে মুসলমানদের মনে ইংরেজবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসারের চেষ্টা কংগ্রেস না নেওয়ায় মুসলিম লীগের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের চিন্তা বাড়তে থাকে। ১৯১৬ সালে কৌশলে ইংরেজরা লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে দিল।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়ে পরাজিত তুর্কিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করায় মুস্তফা কামাল পাশা ক্ষমতাচ্যুত করলে ভারতে এর বিরুদ্ধে 'খিলাফত আন্দোলন' শুরু হয়। আর এই সময় গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করেন। ফলে 'রাষ্ট্রের আগে ধর্ম'— এই উগ্রতা বাড়তে থাকায় ১৯২০ সালের কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি বিজয় রাঘবাচারী, অ্যানি বেসান্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ খিলাফত আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও পরোক্ষে বিচ্ছিন্নতা প্রশ্রয় পেল গান্ধীজীর সমর্থনের জন্য। ক্রমে ক্রমে মৈত্রীভাব কাটতে শুরু করে। শুরু হলো জেহাদি হিন্দুবিরোধী গণনির্যাতন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ১৯২৬ সালে নিহত হলেন আব্দুল রশিদ নামে এক মুসলমান যুবকের হাতে। কিন্তু জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করে বিচ্ছিন্নতাকে পুষ্ট করা শুরু হলো। যে মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন এক প্রমুখ জাতীয়তাবাদী, তিনি লোকমান্য তিলকের অনুগামী ও তাঁর হয়ে মামলা লড়েছিলেন। তিনি আগা খাঁর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিকে বিরোধিতা করেন, তিনি বলতেন আমার প্রথম নিষ্ঠা রাষ্ট্র। তিনি ধর্মীয় বিষয় বলে খিলাফত আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। তাকে ক্রমশ উপেক্ষা করতে করতে দুরে ঠেলে দিতে থাকলে কংগ্রেস। কিন্তু এই উপেক্ষিত রাষ্ট্রবাদী নেতা ক্রমে যখন বিচ্ছিন্নতাকে আশ্রয় করলেন তখন তাকে অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করল কংগ্রেস।

১৯২৭ সালে তার সভাপতিত্বে চারটি দাবি জোরালো হয়ে উঠল—

১। সিন্ধুকে মুম্বই প্রদেশ থেকে পৃথক করতে হবে।

২। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও বালুচিস্তানকে পূর্ণ গভর্নর শাসিত প্রদেশের মর্যাদা দিতে হবে।

৩। পাঞ্জাব ও বাংলাতে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে।

৪। কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমান হবে।

বিপজ্জনকভাবে কংগ্রেস প্রথম তিনটি দাবি মেনে নিলে জিন্না কংগ্রেসের মধ্যে নতির স্বীকারের মনোভাব বুঝতে পারেন। মাঝখানে

অনেক ঐতিহাসিক বৈঠক হলো। আন্দোলন হলো, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে ১৯৩৭-এ সাম্প্রদায়িক নির্ণয়ের ভিত্তিতে যে নির্বাচন হলো তাতে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ধরাশায়ী হলো। মুসলমান নির্বাচন ক্ষেত্রের ৪৮৫টি আসনের মধ্যেও তারা পেল কেবল ১০৮টি আসন। ফলে জিন্না ক্রমশ আক্রমণাত্মক বিচ্ছিন্নতাবাদী পথ অবলম্বন করলেন। ইংরেজরাও এই সুযোগে লীগ ও জিন্নার গুরুত্ব বাড়াতে শুরু করলেন। ক্রমশ তারা জিন্নাকে মহাত্মা গান্ধীর সমান মর্যাদায় উন্নীত করল। ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশের দাবি করে। ফলে বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হতে থাকে।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয় হয়। ক্রমে বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দিতে পণ্ডিত নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর মাধ্যমে 'ক্রিপস্ মিশন' প্রস্তাব পেশ করলো যার মধ্যে বিভাজনের বীজ লুকিয়ে ছিল। এর মধ্যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলো। কিন্তু ক্রমশ দ্বি-জাতিতত্ত্বের কালো ভয়ঙ্কর মেঘ ঘনীভূত হতে থাকলো। ১৯৪৪ সালের মে মাসে কারাগার থেকে বেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী জিন্নার বাড়িতে ১৯ দিন ধরে (সেপ্টেম্বর) কথাবার্তার পরে জিন্নাকে 'কায়দে আজম' ও জিন্না গান্ধীজীকে 'মি. গান্ধী' বলে সম্বোধন করা শুরু করলেন। ক্রমশ জিন্না বিচ্ছিন্নতাকে আগ্রাসী করে তুললেন। এমনকী ১৯৪৫-এর জুনে ভাইসরয় ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের যে রূপরেখা প্রস্তুত করেন তাতেও ক্রমে কংগ্রেস অখণ্ডতা বিরোধী মনোভাবকেই তুলে ধরেন। ১৯৪৫-৪৬-এ 'অখণ্ড ভারত' ও 'পাকিস্তান' ধ্বনি তুলে যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলমান লিগ নির্বাচনে নেমে কংগ্রেস বিজয়ী প্রাধান্য পেতেই লীগ ক্রমশ উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬-এ 'প্রত্যক্ষ লড়াই' ঘোষণা করে। বিভিন্ন জায়গায় মিটিং, মিছিল করে হিন্দু বিরোধী স্লোগান তুলতে থাকে। ১৬ আগস্ট কলকাতায় বিশাল মিছিলে 'লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান' ধ্বনি ওঠে। ভয়ানক নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, বলাৎকার ঘটে।

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, সোহরাবর্দি কন্ট্রোল রুম থেকে নির্যাতন পরিচালনা করলেন। এদিকে ইংরেজ গভর্নর অন্ধ ও কালা হয়ে নীরব রইলেন। পরে হিন্দুরা গর্জে উঠলে সেনা ডাকলেন। পূর্ব বাংলার নোয়াখালিতে মুসলমানরা নৃশংস অত্যাচার চালাল। বিহারেও আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু কলকাতা ও বাংলার বুকের অত্যাচারের তেমন কোনো প্রতিবাদই হলো না। পরে ভাইসরয় ওয়াভেল নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানালে, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ জিন্না মুসলমানদের নিয়ে কালো পতাকা দেখিয়ে বিরোধিতা করলেন। নির্মমভাবে হত্যা হতে হলো শফাউত আহমদ খাঁকে যাতে বিচ্ছিন্নতা বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায়। ইতিমধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়, কারণ বৃটিশরা আর ভারত নিয়ে অন্য কিছু ভাবতে চাইল না। এটলি পরবর্তী ভাইসরয় হিসাবে ভারতে এসে কথাবার্তা শুরু করে বুঝতে পারেন জিন্নার কুটিল চালে ক্রমশ দেশভাগের সম্ভাবনা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ফলে তিনিও কৌশলে ২ জুন ভি.পি. মেননের যোজনা সামনে রাখলেন আর ক্রমে বিভাজন স্পষ্ট হতে থাকল। ৩ জুন, এটলি হাউস অব কমন্সে এই পরিকল্পনা বিধিবদ্ধ রূপে ঘোষণা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ১৯৪৮-এর জুন থেকে এগিয়ে এনে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট করলেন। এতেও ছিল সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্নতা।

কারণ :

১। কংগ্রেস যাতে পুনর্বিচারের সময় না পায়।

২। মুসলিম লীগও তাই।

৩। দেশ বিভাজন বিরোধী জনআন্দোলন যাতে না গড়ে ওঠে।

৩ জুন পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন দেশভাগের পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেও গান্ধীজী ক্রমে এই বিভাজন মেনে নেন। প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৭, বিপক্ষে ২৯ আর ৩২ জন নিশ্চুপ ছিলেন। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাকেই স্বীকৃতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করল কংগ্রেস। 'অখণ্ড ভারতে'র স্বপ্ন ভেঙে বিচ্ছিন্নতায় জন্ম হলো ১৯৪৭-এর ১৪-১৫ আগস্ট মধ্য রাত্রের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার এক অন্য রূপ। বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এই দিনের আগের ও পরের রক্তপাতকে যথার্থভাবে বর্ণনা করা হয়েছে একটি বাক্যে— ''Non-violence killed more people than violence could here.''। বীর সাভারকর, মহর্ষি অরবিন্দ, এম এস গোলওয়ালকর প্রমুখ মহাপুরুষ-সহ বহু মানুষের মনে দেশভাগের বেদনা প্রকট হয়। কারণ যাঁরাই দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন তাদের সামনে ছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। বিচ্ছিন্নতা কেউ চাননি। আজও চান না। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের অন্তরালে শহিদদের আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদে। ভাবতে হবে কী চাওয়া হয়েছিল আর কী পেলাম। উত্তর পেয়ে যাবেন বিবেকের কাছে। ইতিহাসের পাতা থেকে নিজেরা পরিশ্রম করে সত্যকে দেখুন, বুঝুন। স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়, কিন্তু শাশ্বত শপথ অধরা থেকে গেছে। আর একবার পরে দেখুন মিজানুর রহমানের 'কৃষ্ণ ষোলই'। জানা যাবে ইতিহাসের অজানা কথা।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

আফস্পা যুক্তরাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ

তারক সাহা

তারিখটা ১ নভেম্বর ২০০০ সাল।

ইম্ফলের এক বাসস্ট্যান্ডে কিছু মানুষ অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই বাস আসার কথা। হঠাৎই গুড়ুম গুড়ুম শব্দের একটা আওয়াজ। মুহূর্তের মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। বাসস্ট্যান্ডে তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। নিথর কয়েকটি দেহ। কয়েকজন কাতরাচ্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। সে এক অসহনীয় মর্মান্তিক দৃশ্য।

কিছুক্ষণ পরেই স্পষ্ট হলো নিরাপত্তা কর্মীদের গুলিতেই অকালে প্রাণ গেল কয়েকজন নিরীহ মানুষের। কিন্তু কিছু করারও নেই। সেনাদের হাতে আছে বিশেষ ক্ষমতা— আফস্পা।

কিন্তু একটি মণিপুরী তরুণী— ইরম শর্মিলা সেনাবাহিনীর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। পরদিন অর্থাৎ ২ নভেম্বর থেকে অনশন শুরু করলেন। যতদিন এই আদেশ প্রত্যাহৃত না হয় ততদিন তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন। সেই শুরু ইরম শর্মিলার অনশনের। এরপর ষোল বছর পার হয়ে গেছে। নদী দিয়ে গড়িয়ে গেছে অনেক জল। ইরম নাকি একটা কুটো দাঁতে কাটেনি। কিন্তু কী যেন কী হলো। হঠাৎ ঘোষণা করলেন— তিনি অনশন প্রত্যাহার করবেন। না, পরিস্থিতির তো তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। সরকার এক চুলও নড়েননি। আফস্পা (আমর্ড ফোর্সেস অ্যাক্ট, স্পেশাল পাওয়ার— সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন) প্রত্যাহার হয়নি। কিন্তু কী এই আইন যা প্রত্যাহারের জন্য ধর্নুভাঙা পণ করেছিলেন ইরম? সেটাই একবার ফিরে দেখা যাক।

ভারতীয় সংসদ ১৯৫৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এই আইন পাশ করে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষত অবিভক্ত অসমে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বাড়-বাড়ন্তকে দমন করতে সেনাবাহিনীর হাতে এই আইনি অস্ত্র

ইরম শর্মিলা

তুলে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৮৩ সালে পঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করতে এবং ১৯৯০ সালে ভারতীয় অখণ্ডতার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ কাশ্মীরেও প্রযুক্ত হয়।

এই আইন প্রণয়নের কেন দরকার পড়ল তা জানতে গেলে আমাদের অনেকটা পিছনে যেতে হবে। দেশ সবে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৫১ সালে নাগা জাতীয় পর্ষদ (Naga National Council বা NNC) একতরফা ঘোষণা করল যে, তারা যে অবাধ গণভোটের আয়োজন করেছে তাতে ওই অঞ্চলের ৯৯ শতাংশ মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম নাগা রাজ্যের পক্ষে ভোট দিয়েছে। এই ঘোষণায় প্রামাদ গুনলো তৎকালীন অসম-সহ কেন্দ্রীয় সরকার। নাগা অধ্যুষিত তৎকালীন অসম রাজ্যের মানুষ ১৯৫২ সালে দেশের সর্বপ্রথম সংগঠিত নির্বাচন বয়কট করল এবং সেই সঙ্গে সরকারি বিদ্যালয় এবং সরকারি দপ্তরও। এই বিদ্রোহ দমন করতে তৎকালীন অসম সরকার ১৯৫৩ সালে নাগা পাহাড়ে লাগু করল Assam Maintainance of Public Order (Autonomous District) Act। এই আইন মারফত রাজ্য পুলিশের হাতে বিদ্রোহ দমন করতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হলেও পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ওই অঞ্চলের পরিস্থিতি। এরপর ডাক পড়ে সেনাবাহিনীর এক অংশ অসম রাইফেলের। কিন্তু এতেও পরিস্থিতি সামলানো গেল না উল্টে নাগা জাতীয় পর্ষদ (এনএনসি) নাগা অঞ্চলে সমান্তরাল সরকার গড়লো। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চে গঠিত এই সরকারের নাম ছিল The Federal Govenment of Nagaland। উদ্ভূত পরিস্থিতি সেই সময়ে যেভাবে গড়াচ্ছিল তাতে ঘুম টুটে গেল কেন্দ্রীয় সরকারের। দেশের সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমূলে বিনাশ করতে সরকার এক অধ্যাদেশ (The Armed Forces (Assam and Manipur) Special Power ordinance) আনলো। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ২২ মে ১৯৫৮ সালে সেই অধ্যাদেশে সই করেন। যা প্রথামাফিক আইনে রূপান্তরিত হয় ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর। এই আইনে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সেনা বাহিনীকে। তারা সন্দেহ হলেই বিনা ওয়ারেন্টে যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করতে পারবে এবং বিনা অনুমতিতে যে কোনো স্থানে তল্লাশি চালাতে পারবে এবং এর জন্য কোনো আদালতের আদেশের প্রয়োজন হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সমস্ত আইনকে বাতিল করে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা সামলাতে নিজের হাতে তুলে নেয় এই আইন। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ৩৫৫ অনুচ্ছেদে যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান রয়েছে তদনুসারেই এই

আইনের প্রয়োগ।

উল্লেখ্য, একসময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যে এই আইনের পরিসর ব্যাপ্ত থাকলেও গত বছর ২০১৫ সালের জুন মাসে ত্রিপুরার অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ায় মানিক সরকার ওই রাজ্য থেকে আইনটি প্রত্যাহার করে নেন। তবে নাগাল্যান্ডে আরো এক বছর এই আইন থাকবে। উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারের আমলে আইনটি চালু হলেও পরবর্তীকালে এই আইনটি নিয়ে কোনো সরকার এর প্রয়োগ বা রদ নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

৯ আগস্ট ২০১৬-তে ইরম শর্মিলা তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের প্রলম্বিত অনশন তুলে নিলেও সেই রাজ্যে এখনও চালু রয়েছে আফস্পা। অর্থাৎ তাঁর দীর্ঘ ষোলো বছরের অনশন কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। তাঁর অনশন ভঙ্গে দেখা যায়নি কোনো বড় মাপের রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতি, কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মিডিয়ার লোকজন ছাড়া। টাডা বা পোটা-র প্রয়োগ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও আফস্পা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপের কাছে নত স্বীকার করেছে টাডা এবং পোটা। ইরম শর্মিলার মতো কিছু মানুষের প্রশ্ন তবুও, দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবাহিনী কেন লড়বে? তাঁদের মতে, নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে প্রবল ক্ষমতা থাকায় তারা যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ করছে। আর এর বিরুদ্ধে আদালতে কোনো মামলা রুজু করা যাবে না।

মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের অভিযোগে যে একেবারেই সারবত্তা নেই এমনটা নয়। সুপ্রিমকোর্ট নিয়োজিত কমিটিও বলেছে যে, এই আইন মানুষের মধ্যে হিংসা, ঘৃণার জন্ম দিচ্ছে, অবিচার, নির্বিচারের আবহ তৈরি হচ্ছে সুরক্ষা বাহিনীর অতিরিক্ত সক্রিয়তায়। বিষয়গুলি সরকারের নজরে নেই এমনটা নয়, কিন্তু দেশের নিরাপত্তার তাগিদে বাহিনীর মনোবল অটুট রাখার জন্য কোর্ট মার্শাল হওয়া কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

গত জুলাই মাসের শুরুতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত গত কুড়ি বছরে যে ১৫২৮টি সাজানো লড়াই-য়ের অভিযোগ রয়েছে তার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ হলো--- অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো রাজ্য নিরাপত্তাবাহিনীর অধীনে থাকতে পারে না এবং এটা হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি উপহাসমাত্র। সাধারণভাবে নিরাপত্তা বাহিনীকে নিজেদেরই দেশের নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

অন্য পক্ষের যুক্তি হলো, জঙ্গি দমন এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন অতিশয় কঠিন কাজ। সুতরাং সেনাবাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান না হলে তারা কেন লড়বে এবং কীসের ভিত্তিতে লড়বে? সম্প্রতি কাশ্মীরি হিজবুল জঙ্গি বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল কাশ্মীরে নিরাপত্তা কর্মীদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া না থাকলে তারা প্রাণে মারা পড়বে। জনরোষ দমন করতে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হলে কিছু নিরপরাধ মানুষ, শিশুর দুঃখজনক মৃত্যু হলেও প্রশাসনের কিছু করার থাকে না। এই সব ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিশিষ্ট সামরিক আধিকারিকদের মতে, জঙ্গি দমনে ব্যবস্থা নিতে গেলে বাহিনী কীভাবে আদালতের নির্দেশ নিয়ে ব্যবস্থা নেবে? দিল্লীর এক সামরিক বিশ্লেষক অজয় শাহানির মতে— 'জঙ্গি দমন অথবা অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা দমন কোনো ফুটবল ম্যাচ নয়, বরং জীবন-মৃত্যুর মাঝে জওয়ানদের দাঁড়িয়ে থাকা। সুতরাং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাহিনীর হাতেই থাকা দরকার।' আবার কিছু অবসরপ্রাপ্ত সেনারা মনে করেন যে, সেনাবাহিনীর তরুণ কর্মীরা দেশপ্রেমের জোয়ারে ভেসে অতি তৎপর হয়ে পড়ে এবং পদোন্নতির জন্য বা পদক প্রাপ্তির আশায় অনেক সময়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

আফস্পা এতটাই স্পর্শকাতর যে, রাজনীতিবিদরা সহজেই এর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চায় না। অতীতে আফস্পার জন্যই পঞ্জাবের বিদ্রোহ দমন করা গেছে। ১৯৮৩ সালে লাগু হওয়া আফস্পা পঞ্জাবের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কারণে এখন আর সেখানে নেই। কাশ্মীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন আফস্পার বিরুদ্ধে যত গলা ফাটিয়েছেন আজ ক্ষমতার অলিন্দে থাকায় অনেক মৃদু স্বরে বলছেন যে, আফস্পা কিছুদিনের জন্য তুলে দেখা যেতে পারে।

মেহেবুবার পূর্বসূরি ওমর আবদুল্লাও চাননি যে, আফস্পা পুরোপুরি উঠে যাক কাশ্মীর থেকে, বরং চিদাম্বরমের সঙ্গে আলোচনায় তিনি চেয়েছিলেন যে, মধ্য কাশ্মীরের কিছু অংশ থেকে আফস্পা তুলে দেওয়া হোক। চিদাম্বরম ওমরের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেও আদতে নিরাপত্তার কারণেই তোলা হয়নি। কাশ্মীরি মানবাধিকার কর্মীরা রাজ্যের পরিস্থিতি না বুঝেই চাইছে সমগ্র কাশ্মীর থেকে সেনা তুলুক সরকার। তবে একটা জিনিস খুবই স্পষ্ট যে, মানবতাবাদীরা যাই বলুক শাসক এবং রাজ্যের শান্তিপ্রিয় নাগরিক কেউই চায় না সেনা তাদের রাজ্য থেকে চলে যাক।

আফস্পা নিয়ে রাজনৈতিক দোলাচল চলছেই। কারুর মতে, ক্ষমতাসীনরা চায় আইনটা থাক এবং যখনই তারা বিরোধী পক্ষে অবস্থান করে তখনই সুর পাল্টে ফেলে। পূর্বতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের কথায়— আইনটা থাকুক, কিন্তু আইনের প্রয়োগের কঠোরতা কমুক। আইনজীবী নন্দিতা হাসকর বলেন, আইনটির প্রয়োগ আরও মানবিক হোক। কিন্তু আসল বিষয় হলো, আফস্পা কোনো রাজ্যে থাকবে কিনা তা নির্ভর করছে সেই রাজ্যের ওপরেই। যেমন অতীতে ত্রিপুরা বা পঞ্জাবের মতো রাজ্যে আফস্পা বাতিল করেছে সেই সেই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার পর। ইরম শর্মিলা অনশন ভঙ্গ করলেও কিন্তু তিনি ফিরলেন সেই আফস্পা অধ্যুষিত মণিপুরেই। গণতন্ত্রে অনশন আন্দোলনের এক শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু মণিপুরে আফস্পা না ওঠাতে তাঁর এই আন্দোলনের যৌক্তিকতার প্রশ্ন উঠছে। দেশের রাজনৈতিক নেতারা যতই দ্বিচারিতা করুন, একান্তভাবে এরা মনে করেন 'আফস্পা এক যুক্তরাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ।'

বনবাসী সমাজে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন ড. অচ্যুত সামন্ত

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মনে সমাজসেবার সদিচ্ছা থাকলে অর্থ কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ওড়িশার অচ্যুত সামন্ত। একক প্রচেষ্টায় তিনি শূন্য থেকে শুরু করে পৌঁছেছেন একশোতে।

অতি শৈশবে পিতৃহারা হন তিনি। পথদুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হয়। বাবা অনাদি চরণ সামন্ত ছিলেন এক সামান্য কর্মচারী। তিনি বেঁচে থাকাকালীন কোনোমতে সংসার চলত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অকূল পাথারে পড়ে সামন্ত পরিবার। মাথায় খড়ের ছাউনিটুকু টিঁকিয়ে রাখতে আর কোনোমতে প্রাণটুকু ধিকিধিকি করে বাঁচিয়ে রাখতে দু'তিন দিন অন্তর অন্তর ভাতের ফ্যান আর বুনো শাকপাতা ছিল ভরসা। বয়স তখন ছয় কী সাত। মায়ের চোখের জল মোছাতে স্কুলের সময়ের ফাঁকে ফাঁকে এদিক-সেদিক কাজ করতে শুরু করে সে। গ্রামের প্রতিবেশীদের জন্য দোকান থেকে জিনিস এনে দেওয়া, হাতে হাতে কাজ করে দেওয়া, তার বদলে যেটুকু টাকা পেত তার থেকে এক টাকা সে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখতো এক চায়ের দোকানে কাজ করা তার বন্ধুদের জন্য। চরম দারিদ্র্য, তবুও তার মাঝে কষ্ট করে পড়াশোনাটুকু চালিয়ে গেছেন তিনি। অবশেষে দারিদ্র্যের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে জয়ী হন। আটের দশকের শেষে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ করে স্থানীয় একটি কলেজে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। পরিবারের পাশাপাশি তিনি তার গরিব বন্ধুদের সাহায্য করার প্রচেষ্টায় প্রাইভেট টিউশন শুরু করেন।

বনবাসী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ড. অচ্যুত সামন্ত।

কিন্তু এতেই তৃপ্ত ছিলেন না তিনি। সমাজের গরিব অবহেলিত মানুষদের জন্য তিনি তাঁর সহায়তার পরিধি বাড়াতে চেয়েছিলেন আরও কয়েক গুণ। তিনি অনুভব করেছিলেন জনজাতির মধ্যে উন্নতি ঘটাতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানো। তাই নিজের টাকায় একশোজন ছাত্র থাকার মতো একটা ছোটো জায়গা তিনি ভাড়া নিয়ে ১৯৯৩ সালে শুরু করলেন কিস্— কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশাল সায়েন্স। ২৩ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বনবাসী ছাত্রদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কিস্-এ আজ ছেলেমেয়ের সংখ্যা ২৫ হাজার। যার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১২ হাজারের বেশি। এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে তিনি সন্তানবৎ স্নেহ করেন। একজন বাবা যেমন তার সন্তানকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করার পাশাপাশি স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত তার পাশে থেকে সবরকম সহায়তা করে যান, ঠিক তেমনই ড. অচ্যুত সামন্ত বনবাসী ছেলেমেয়েদের প্রথামাফিক শিক্ষা দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং পর্যন্ত দেন। যাতে তারা স্বনির্ভর হয়ে ভালোভাবে জীবনটা কাটাতে পারে। এমনকী মেয়েদের নার্সিং ট্রেনিং দেওয়ার উদ্যোগও নিয়েছেন।

অথচ ১৯৯২-৯৩ সালে কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীর থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও নিজের যৎসামান্য সঞ্চয় সম্বল করে এই কর্মযজ্ঞ শুরু করার পর এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যখন তার মাথায় কয়েক কোটি টাকার ঋণের বোঝা। এই বিপুল পরিমাণ টাকা শোধ না দিতে পারার ব্যর্থতায়, চিন্তায়, লজ্জায় নিজের মৃত্যুকামনা পর্যন্ত করেছিলেন। অথচ আজ কিস দেশের মধ্যে বৃহত্তম অবৈতনিক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা আই আই টি, এন আই টি, আই আই এসের কৃতী ছাত্রছাত্রী হিসেবে কিস-এর প্রতিষ্ঠা সার্থক করেছে। শিক্ষাবিস্তারের স্বপ্নে সফল হয়ে অচ্যুত সামন্ত আগামী এক দশকের মধ্যে ২ লক্ষেরও বেশি বনবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে চান। দেশে আরও ১০টি রাজ্যে রাজ্য সরকারের সহায়তায় কিস-এর প্রসার ঘটাতে চান।

কিস ছাড়াও তিনি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন কিট (কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি), কে আই আই টি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (কে আই এস), কলিঙ্গ ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (কেআইএমএস), যেখানে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ ভুলে সকলে একসঙ্গে ছাত্র পরিচয়ে পড়াশোনা করে।

সমাজের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া, শিক্ষাবঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখার জন্য বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ভারত বাদ দিয়ে কোরিয়া, কম্বোডিয়া, কাজকিস্তান, কিরখিজস্তান, রাশিয়া, দোহা প্রভৃতি দেশ থেকে প্রাপ্ত পুরস্কারও রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের যে দৃষ্টান্ত অচ্যুত সামন্ত বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন, তা অনুকরণযোগ্য, অনুসরণযোগ্য। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

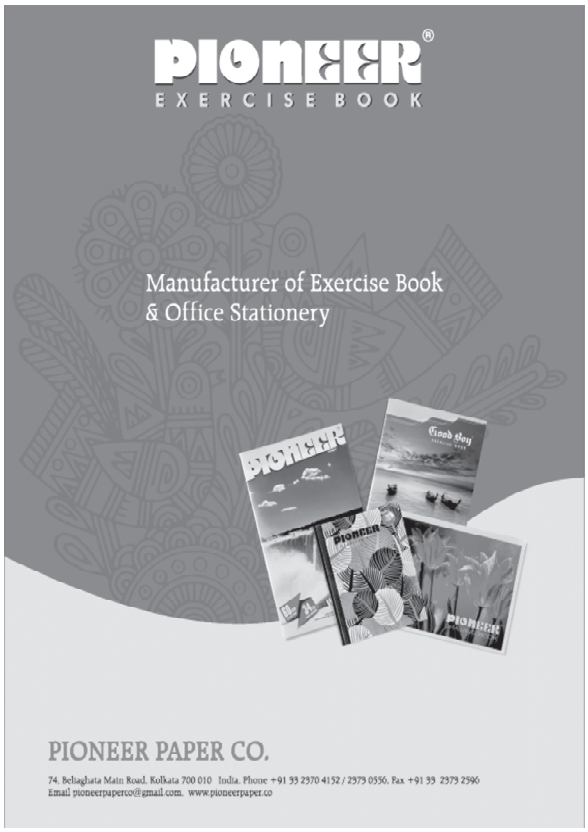

‘ভারতে মাত্র একজনের মনেই এই প্রয়োজনের (ভারতীয় মনোভাবসম্পন্ন হবার) কথা প্রতিভাত হয়— তিনি মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। জনগণের প্রকৃত প্রয়োজন কী তৎক্ষণাৎ তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং অতীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ বলে অর্জিত হয়েছে তা সংরক্ষিত করার ইচ্ছা পোষণ’ করেন। কেবলমাত্র গোপীলীলা এবং ভগবদ্‌গীতা (যাতে বারবার স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রের কথা বর্ণিত) এই দুই আকারেই যে তিনি অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে পরিচিত তা নয়। কারণ সমগ্র মহাভারতে তাঁরই কাহিনী, তাঁরই ভক্তগণ কর্তৃক বিবৃত এবং মহাভারতের প্রথমেই ঘোষিত হয়েছে, এটি জনসাধারণের জন্য।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গ নামে কোনো ক্ষতি নেই; পশ্চিম বাংলাদেশ যেন না হয়

বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' পরিবর্তন করে বঙ্গ বা বাংলা করার সুপারিশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের এই চিন্তা-ভাবনা এর আগেও একবার করা হয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন এবং তাঁর দলের বিরোধিতায় সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এখন তিনি রাজ্যে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং মূলত তার উদ্যোগেই আমাদের রাজ্যের নাম পরিবর্তনের জন্য এই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের নাম পরিবর্তনের স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, আন্তঃরাজ্য সম্মেলনে রাজ্যের নাম (ওয়েস্ট বেঙ্গল) ইংরাজি 'ডব্লিউ' দিয়ে শুরু হওয়ার জন্য তিনি সবার শেষে বক্তব্য রাখার সুযোগ পান এবং তখন তাঁর বক্তব্য শোনার মতো আর কারও ধৈর্য থাকে না। কিন্তু রাজ্যের নাম বাংলা' বা 'বঙ্গ' হলে বর্ণানুক্রম অনুযায়ী অনেক এগিয়ে আসবে এবং তিনি রাজ্যের কথা বলার জন্য অনেক আগে সুযোগ পাবেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির নামকরণে এক ইতিহাস ও দেশভাগের যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে, সেটি যে তাঁর অজানা নয়, তা আমরা ভালোভাবেই জানি। তবুও অহেতুক এক অজুহাত বানিয়ে কেন আধুনিক প্রজন্মের কাছে এই রাজ্যের ইতিহাস ও দেশভাগের যন্ত্রণাকে বিস্মরণ করাতে চাইছেন। তার চাইতে বরং আমাদের এই রাজ্য যাতে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' নামে একটি ইসলামিক দেশ না হয় সেইদিকে নজর দেওয়া উচিত। কেন 'পশ্চিম বাংলাদেশ' কথাটি বললাম তার ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি।

মমতাদেবী, আপনার আমলে খাগড়াগড় কাণ্ড ঘটেছে, কালিয়াচকের মুসলমান দুষ্কৃতীরা হিন্দুদের বাড়ি, দোকান, গাড়ি, থানা, জ্বালিয়ে দিল, আপনার আমলে হিন্দুরা মুসলমান পরবের জন্য প্রতিমা নিরঞ্জন করতে পারে না, রথযাত্রা বের করতে পারে না। আপনার আমলে কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য গো-মাংস ভক্ষণ করা হয় অথচ শূয়োরের মাংস খাওয়া হয় না। আপনার প্রিয় ভাই তথা পুরও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী কলকাতাকে মিনি পাকিস্তান বানানোর দুঃসাহস করে। কিন্তু আপনি বা আপনার প্রশাসন চুপ করে থাকে। আপনি সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে চান না, কারণ আপনি ভয় পান পাছে আপনার মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে ধস নামে। আপনি পাকিস্তানের গায়ক গুলাম আলিকে ঘটা করে সংবর্ধনা দেন, পাকিস্তানি কবি ইকবালকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করেন, ইমামদের ভাতা দেওয়ার প্রয়াস করেন। আপনার এবং আপনার দলের এই সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কি মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না?

আজকে আপনি, আমরা যে রাজ্যে বসবাস করছি, সেই রাজ্যের জনক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হোত না আর আপনিও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। অথচ সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে আপনি না করেছেন শ্রদ্ধা, না দিয়েছেন সম্মান। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বামপন্থী বা কংগ্রেসের কোনো পার্থক্য নেই।

তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন রাখছি অযথা পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আপনি করবেন না। তার চাইতে বরং আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং মৌলবাদীদের বৃহত্তর বাংলাদেশের চক্রান্তের হাত থেকে যাতে আপনি আমাদের রাজ্যকে বাঁচাতে পারেন সেই বিষয়ে তৎপরতা দেখালে এই রাজ্যের নাগরিকরা আপনাকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবে।

—অসীম সাহা,

রায়গঞ্জ, উত্তরদিনাজপুর।

জাতীয় সঙ্গীত না গাওয়ার ফতোয়া

স্বাধীন ভারত। প্রত্যেক স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত থাকে। কোনো দেশের আবার একাধিক জাতীয় সঙ্গীত। যেমন--- সুইজারল্যান্ডের তিনটি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ও স্তোত্র হলো— 'বন্দে মাতরম্' ও জাতীয় সঙ্গীত 'জন-গণ-মন'। জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় মাতৃভূমি তথা জন্মভূমিকে বন্দনা করে। জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় একাত্মতার প্রতীক। দেশ-জননী তথা মাতৃভূমির বন্দনা গীতি।

১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরম্' গানে যুবসমাজ নব-প্রেরণা লাভ করত। 'বন্দে মাতরম্' কেবল স্লোগান নয়, এ জাতীয় জাগরণের মন্ত্রবিশেষ। দেশমাতৃকার বন্দনায় এ গানের কোনো বিকল্প হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের 'জন-গণ-মন' গানটি ১৯১১ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম গাওয়া হয়। পরবর্তী ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারতের Constitunal Assembly-র সভাপতি এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবিঠাকুরের 'জন-গণ-মন' (যাতে রয়েছে Historic Part-এর স্মৃতি) গৃহীত হয়েছে National Song হিসাবে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সর্বপ্রকার স্বাধীনতা আন্দোলন ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকি-বাঘাযতীন-অরবিন্দ-সূর্য সেন-মাতঙ্গিনী- উল্লাসকর প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের জীবন উৎসর্গ অথবা ফাঁসির দড়ি গলায় পরার প্রাক মুহূর্তে গগনভেদী 'বন্দে

মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ ঐশী শক্তির উল্লাস স্মরণীয়। স্বাধীনতার নব-উন্মাদনার মূল মন্ত্র স্বাধীনতার ৬৮ বছর পর ধর্মনিরপেক্ষতা ও শরিয়তের পরিপন্থীর অজুহাতে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' ও 'জন-গণ- মন-অধিনায়ক' (এলাহাবাদের এম, এ কনভেন্ট স্কুলের ম্যানেজার মহম্মদ জিয়াউল হকের) না গাওয়ার ফতোয়া অ-সাংবিধানিক, আইন-বিরুদ্ধ ও দেশদ্রোহিতা। এই নির্দেশের অর্থ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক— যা অমর্যাদাকর, বেদনার ও পরিতাপের। প্রশ্ন জাগে— শালীনতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্বাভিমানের উপর কি পরিকল্পিত আঘাত নাকি জাতীয় উন্মানদনার স্লোগান আজ জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী? নাকি বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বাড়ছে বিকৃত রুচিবোধ? যার প্রভাবে শ্রদ্ধার-মর্যাদার বিষয়গুলোর উপর নামছে আক্রমণ! ইতিপূর্বে দেবী সরস্বতী ও ভারতমাতার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত ছবি অঙ্কন দ্বারা গরিষ্ঠসমাজকে আঘাতের ঘটনা স্মৃতিপটে বর্তমান। জন-গণ-মন-অধিনায়ক না গাওয়ার ফতোয়া প্রসঙ্গে জন-গণ-মন-অধিনায়কদেরই নির্ণয় করতে হবে— বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেশের সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হবে না শারিয়তি অনুসারের রাষ্ট্রভীতি বা দেশদ্রোহিতা—কী প্রাধান্য পাবে?

—অশোক কুমার মণ্ডল,
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

আই এস এবং সেকু-মাকুদের চরিত্র

এখন খবরের কাগজের পাতা খুললেই দেখা যাচ্ছে গুজরাটের উনাতে দলিত নির্যাতন, মধ্যপ্রদেশে গোমাংস বহনকারী দুই সংখ্যালঘু মহিলাদের নির্যাতন, আর কাশ্মীরে বুরহান ওয়ানির মৃত্যু ঘিরে কাশ্মীরে অস্থিরতা আর সেকু-মাকুদের লম্বা চওড়া কথা। সেই তুলনায় কর্ণাটকে দলিত নির্যাতন, বিহারে ১৫ টাকা ফেরত দিতে না পারায় খুন, মুখের উপর প্রস্রাব ছিটিয়ে দেওয়া, বুলন্দশহরে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ নিয়ে তেমন হৈচৈ হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু বা দলিত নির্যাতন কোনো ব্যাপার নয়, এটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ। কারণটা কী? ১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে বৃটিশরাজের হাতে যায়। তারপর ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। বৃটিশ কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু সফল হতে পারেনি। সেজন্য তাঁরা ডিভাইড রুল চালু করে। প্রথমদিকে তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলছিল মুসলমানদের উপেক্ষা করে এবং মুসলমানরাও ইংরেজদের হাতে সাম্রাজ্য হারানোর ফলে বৃটিশদের থেকে আরো দূরে সরে যায়। এই যখন অবস্থা বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বৃটিশরা মুসলমানদের তোল্লা দিতে শুরু করে। প্রথমেই বঙ্গবিভাগ এবং স্বদেশিকতাকে হিন্দুদের জাগরণ বলে শুরু করল এবং মুসলমানদের আলাদা করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য সাফল্যও পায়। আলি ভ্রাতৃদ্বয় মুসলমানদের মুখপাত্র হয়ে উঠল। এমন সময় সাভারকরের নির্বাসন, রাসবিহারী বসুর জাপান চলে যাওয়া, তিলকের মৃত্যু দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ঘটে গেল। গান্ধীজীর অহিংসনীতির আবির্ভাব হলো ও তাঁর মুসলমান তোষণনীতি শুরু হলো খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করার মাধ্যমে। তখন থেকেই ভারতের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের দিন শুরু হলো। মুসলমানদের বা ম্লেচ্ছাচার থেকে বাঁচার জন্য রাজা তথা ব্রাহ্মণরা নানারকম প্রথার বেড়াজালে সমাজটাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছিল। ক্রমে ক্রমে এই কু-রীতি দুর্নীতি হয়ে সমাজকে গ্রাস করে ফেলল। লক্ষ্য থেকে উপলক্ষ্য বড় হয়ে দেখা দিল। বিংশ শতাব্দীতে সেগুলির সংস্কার না করে তাকে মূলধন করে রাজনীতি শুরু হলো। গান্ধীজীর হরিজন নামকরণ এবং তা নিয়ে রাজনীতি শুরু হলো। বৃটিশরাও এই দুর্বলতা বুঝতে পেরে সেটাকে ব্যবহার করে রাজনীতি বা শাসন করা শুরু করে। পরে মুসলমানরাও এই দুর্বলতাকে উস্কে দিয়ে হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা করল। ভারতের নব্য শিক্ষিত নেতারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সস্তার রাজনীতি শুরু করল। তাঁরা ক্ষমতার লোভে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ না হয়ে মুসলমান ও বৃটিশদের ফাঁদে পা বাড়িয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনল। তার পরিণতি মুসলমানদের সহজেই পাকিস্তান লাভ।

এককালে তুরস্ক মিশর থেকে সমগ্র মালয়েশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইসলামের দখলে এসেছিল। ভারতবর্ষ সাত-আটশ বছর মুসলমান শাসনে থেকেও পুরোপুরি ইসলামের ছত্রছায়ায় আনতে পারেনি। তাই তাদের ইচ্ছা নয়া সাম্রাজ্যে এই দেশকে আনতে হবে। শিবপ্রসাদ রায় তাঁর পুস্তকে লিখেছেন— লন্ডনে একটি ইসলামিক সম্মেলন হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখছেন। সেখানে বিশ্বের মানচিত্র রাখা আছে। সেই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে মিশর তুরস্ক থেকে সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইসলামের অধীনে আছে, ব্যতিক্রম ভারত-নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। এই অংশটুকু গেরুয়া হয়ে রয়েছে। এই অংশটুকুকে সবুজ বা ইসলামের অধীনে আনতে হবে, কী করে? ওখানে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটাতে হবে অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যাধিক্য করব তাহলে পাকিস্তানের ন্যায় আরো একটি ইসলামিক দেশ হবে। তখন ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণের হিড়িক চলছে বা ছোট পরিবারের ডাক দেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয় জনগণ এটাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করেছে। এখানে মুসলমানদের জন্মনিয়ন্ত্রণ করা চলবে না উল্টে জনসংখ্যা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে মুসলমান সংখ্যাধিক্য করতে হবে। এখানে এমন এক সরকার বসাতে হবে যাঁরা আমাদের বিরোধিতা তো করবেই না উল্টে আমাদের সমর্থন করে যাবে। সেজন্য আমাদের ওই সমস্ত দলগুলিকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে হবে। ওই সমস্ত নেতাদের লক্ষ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে ভারতকে মুসলিম কান্ট্রিতে পরিণত করা। সেই টার্গেট হয়তো পুরণ হয়নি কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরকম ভাবে চললে ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তখন আর ধর্মনিরপেক্ষ বলার লোক থাকবে না। এসব কথা তখনকার সমস্ত রাজনৈতিক দল বা নেতারা ইন্দিরা গান্ধী থেকে মোরারজী দেশাই সবাই জানত, কিন্তু সবাই চুপ করে থাকত।

—কমল মুখার্জী,
চুঁচুড়া, হুগলী।

মালদহে বিদ্যার্থী পরিষদের ভারতমাতা পূজার সুবর্ণ জয়ন্তী

গত ১৫ আগস্ট মালদার টাউন হলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে ভারতমাতা পূজার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন ও ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সংগঠক শ্রীহরি বরিকর, পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক সুবীর হালদার, দুই সহ-সম্পাদক অভিনন্দন দাস ও তপোবর মিশ্র, মলয় মুখার্জি ও উৎসব চক্রবর্তী প্রমুখ। ছাত্র সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীহরি বরিকর। ১৫০ জন ছাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. তুষার কান্তি ঘোষ।

সিউড়ী সংস্কার ভারতীর শ্রীঅরবিন্দ সাইটলেস ইনস্টিটিউশনে রাখিবন্ধন

রাখিপূর্ণিমার দিন সকালে সিউড়ীতে রাজ্য সরকারের জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের শ্রীঅরবিন্দ সাইটলেস ইনস্টিটিউশনের আবাসিক দৃষ্টিহীন ছাত্রদের নিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করে শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী। অনুষ্ঠানে দৃষ্টিহীন ছাত্ররাও গান পরিবেশন করে। সংস্কার ভারতীর সদস্যরা সবার হাতে রাখি বাঁধেন ও মিষ্টিমুখ করান। সংস্থার প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল সিংহ বলেন, প্রথম এরা রাখিবন্ধন উৎসব করলো। এ ধরনের অনুষ্ঠানে এরা খুবই আনন্দ পায়। সংস্কার ভারতীর সম্পাদক সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাখিবন্ধন উৎসবে দৃষ্টিহীন ভাইদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমরা ধন্য। ওরা রাখি বেঁধে যে আনন্দ পেয়েছে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষক গুরুপ্রসাদ দাস বলেন, আমরা দৃষ্টিহীন ভাইদের হাতে রাখি পরানোর সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।

হুগলী জেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাখি উৎসব

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া প্রখণ্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্তীয় মাতৃশক্তি প্রমুখ সুভদ্রা শর্মার পরিচালনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রাখি বন্ধন করা হয়। পাণ্ডুয়া, থানা, পোস্ট অফিস, রেজিস্ট্রি অফিস ও কোরাপাড়া বস্তিতে রাখি বাঁধা হয়। এছাড়া বিকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সৎসঙ্গের মাতৃ-সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রান্তীয় সৎসঙ্গ প্রমুখ অর্চন সাহা। হুগলী জেলার আরামবাগ, বৈচী, খন্যান, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানে মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনী রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন। ৫০০০ জনকে রাখি পরানো হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ডের বসন্তপুর মণ্ডল শারীরিক প্রমুখ মুরারী মোহন দে তিনদিনের রোগ ভোগের পর গত ১৫ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি মা, স্ত্রী, ৫ ভাই, ৩ বোন ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া (কল্যাণগড়) শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক পৃথ্বীজিৎ বসু গত ১০ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ তথা সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক বিজন বর্মনের মাতৃদেবী দুর্গাবালা বর্মন গত ১৭ জুলাই নদীয়া জেলার বড়েঞা গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগ কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহের অগ্রজ তথা বাঁকুড়া জেলার প্রচার প্রমুখ

মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহের পিতৃদেব অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর বঙ্কিমচন্দ্র সিংহ গত ১৯ আগস্ট গঙ্গাজলঘটিস্থ স্বীয় বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি সঙ্ঘ ও শিশু মন্দিরের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

‘উদ্ধার সম্ভব...উদ্ধার সম্ভব’

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ‘নিষাদ’

বিকাশ ভট্টাচার্য

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মূলত কবি। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবিতা লিখেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার বই ‘আষাঢ়ে শ্রাবণ’, ‘গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’, ‘শবাধারে জ্যোৎস্না’ ইত্যাদি। এই কাব্যসাহিত্যের হাত ধরেই তিনি কবিতা ছেড়ে নাট্যরচনায় মগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক ১৯৬৩-তে গন্ধর্ব পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কণ্ঠনালিতে সূর্য’। এরপর একে একে ‘মৃত্যু সংবাদ’, ‘চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড’ ‘গন্ধরাজের হাততালি’ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু অভিনয়ে কেউ এগিয়ে আসে না। নির্দেশক— অভিনেতা শ্যামল ঘোষ প্রথম এগিয়ে আসেন এবং ‘মৃত্যু সংবাদ’ নাটকটি প্রযোজনা করেন এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা নাট্যমঞ্চে যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেন। বাংলা নাট্যজগতে করেন। তারপর দীর্ঘ বিরতি। ২০০২ সালে সংস্কার ভারতীর তাঁর একটি নাটক প্রযোজনা করে এবং খুবই সুখ্যাতি অর্জন করে। এর চোদ্দ

‘কিমিতিবাদ’ শব্দটির জন্ম থেকেই আলোড়ন তুলেছিল। সাধারণের কাছে তাঁর নাটক ছিল দুর্বোধ্য। মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছিলেন, ‘যেহেতু আমি মানুষ হিসেবে কেবল আমারই মতো, একেবারে আলাদা, তাই ভেবেছি আমি যা লিখব তাও হবে ঠিক আমারই মতো, আলাদা— প্রচলিত ধারার থেকে তা হবে স্বতন্ত্র।...আমার লেখার ইচ্ছের একটা অন্যতম কারণ হলো প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে নিজস্ব পথে চলার তাড়না। ...আমি বুঝি, আমি এমন ক্ষমতাবান লেখক নই যে আমার লেখার মধ্য দিয়ে মানুষের দুরবস্থা বদলে দিতে পারব। তাই বলে কর্তব্যই বা ভুলি কী করে?’

তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম আমাদের আলোচ্য ‘নিষাদ’। নাটকটি ১৯৬৮ সালের শারদীয় ‘অভিনয় দর্পণ’-এ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর পঙ্কজ মুন্সী, প্রদীপ চক্রবর্তী (জামসেদপুর) এবং কিষেণকুমার (হিন্দীতে) এই নাটক মঞ্চস্থ বছর পর ‘একুশ শতক’ আবার এই নাটক মঞ্চায়নে এগিয়ে এসেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথাবিরুদ্ধ নাটক অর্ধশতাব্দী পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক এবং আজকের যুবসমাজকেও তা টানে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য অনুধাবন করে তাঁকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারতেন শ্যামল ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী। বর্তমানে যে ক’জন নির্দেশক-অভিনেতা মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে সঠিক ভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন তার মধ্যে অগ্রগণ্য দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশ শতকের ‘নিষাদ’ নির্দেশনায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে নাটকের কাব্যময়তা অন্যদিকে নাটকের বক্তব্য দর্শকদের সামনে অবলীলায় তুলে ধরেছেন নির্দেশক।

নাটকটির কাহিনি শুনে বা পড়ে এ নাটক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ নাটকের বিশেষতা বুঝতে হলে বা এর কাব্যময়তাকে উপলব্ধি করতে হলে এ নাটক দেখতে হবে। তবু দু-চার কথায় বলি। দিবাকরা একেবারেই আমাদের চেনাজানা ছাপোষা এক চরিত্র। খুব একটা সাহসী নয়। স্বভাবে নেই তেমন দাপট। কোনো জোরালো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য— না তাও নেই। তার অভাব আছে, দুঃখ আছে, হাজার চেষ্টা করেও দু’পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার অক্ষমতা আছে। তবু দিবাকর অপেক্ষা করে সেই মুহূর্তটার জন্য, যখন কাউকে দেখে সে বলে উঠবে— ‘ইউরেকা, ইউরেকা’। এক ম্যাজেসিয়ানের হাত ধরে আসে সেই ইউরেকার সন্ধান। একটা সবুজ মিষ্টি লতার দেখা মেলে, যে তাকে জড়িয়ে বাড়তে চায়।

দিবাকর-লতার ভালবাসা সংসারে গড়ায়। তারা অর্থের পথে, কৌলিন্যের পথে পা বাড়ায়। যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় তাদের হাতে আসে রঙিন আয়না। আয়নায় পড়ে ইচ্ছে সুখের ছায়া— বুকের মধ্যের গোপন পাখি ডানা মেলে বাইরে আসে। আসে প্রলোভন। প্রলোভন থেকে পতন, পতন থেকে মৃত্যু। এরই মাঝে ধ্বনিত হয় এক আর্তি, — ‘উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব’। এ কাহিনিকে বাস্তব আর স্বাভাবিকতায় মুড়ে দিয়েও নাট্যকার ক্ষণে ক্ষণে আমাদের নিয়ে গেছেন পরাবাস্তবের সীমানায়। যা সঠিক ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নির্দেশক দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে দিবাকর ও লতার ভূমিকায় শুভঙ্কর রায় ও মিশকা হালিম এক কথায় অনবদ্য। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে তাদের অভিনয় দেখার মতো। যাদুকর হয়েছেন লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব সাবলীল তাঁর অভিনয়। সেই তুলনায় প্রভুর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তিনি তেমন মনে দাগ কাটেননি। সাংবাদিক দু’জন এণাক্ষী সেন ও রাজাবর্ধন যথাযথ। খোকার ভূমিকায় জয় পাসোয়ানকে আরও স্মার্ট হতে হবে। মঞ্চসজ্জা বলতে ব্যাকড্রপ-এর সিঁড়ির ব্যবহার যুক্তিগ্রাহ্য। বাদল দাসের আলো বিভিন্ন সময়কে ধরেছে। সঙ্গীতে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো। রূপসজ্জাকর অলোক দেবনাথকে যাদুকর ও প্রভুর পোশাক সম্বন্ধে একটু ভাবতে অনুরোধ করব।

একুশ শতককে ধন্যবাদ এমন একটি নাটক উপহার দেওয়ার জন্য। ▮

শব্দরূপ-৮০২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			■	■	
■	■		■	৬	৭	■	■
■	■	৮	৯	■		■	■
১০	■	■	১১			■	১২
	■	■		■		■	
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোটোদের বই, **৩.** 'গীতগোবিন্দ'-এর কবি, **৫.** মস্তিষ্ক, **৬.** বুদ্ধি, জ্ঞান, **৮.** ''—আনন্দে জাগো'', **১১.** মোহনভোগ, হালুয়া, **১৩.** শ্রীকৃষ্ণের পিতা, **১৪.** যযাতির পিতা।

উপর-নীচ : ১. দেবর্ষি (প্রবাদ-কলহের দেবতা), **২.** কলম রাখার আধার, **৩.** মক্কার পবিত্র কূপ, **৪.** গাছের ছাল, **৭.** আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্বে করণীয় স্বর্ণসহ তিলদান, **৯.** শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা **১০.** শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, **১২.** পাগড়ি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯৯
সঠিক উত্তরদাতা

সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা
সুমন্ত চক্রবর্তী
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

■	■	বা	সু	দে	ব	■	খি
ক	পা	লী	■	■	ড়	■	ড়
■	স্থ	■	টা	■	বা	সু	কি
■	পা	ব	ক	■	■	র	■
■	দ	■	■	বা	হ	বা	■
দ্বা	প	র	■	জ	■	হা	■
র	■	সা	■	■	নী	র	স
কা	■	ল	ম্বো	দ	র	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮০২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

আমাদের দেশে ধর্মছাড়া কোনো ভাব বা তার অস্তিত্ব কল্পনা করাই কঠিন। আমাদের দেশ ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারবে না। সুতরাং অর্ধামিক, ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মরহিত, ইত্যাদি শব্দ সকল না আমাদের দেশের আদর্শকে প্রকট করছে— না 'সেকুলার স্টেট'-এর প্রকৃত অর্থ বজায় রাখছে।

ইংরাজিতে 'রিলিজিয়ন' শব্দের আক্ষরিক শব্দ আমাদের দেশে 'মত' এবং এক মতকে যারা মানে তাদেরকে সম্প্রদায় বলে— যেমন, শৈব, বৈষ্ণব, খ্রিস্তী সম্প্রদায় ইত্যাদি। এটা নিশ্চিত যে কোনো রাজ্য বা দেশ এক সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারে না। রাষ্ট্র সকলকে সমান চোখে দেখবে। ফলে আমরা বলতে পারি— যে কোনো রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক না হয়ে অসাম্প্রদায়িক হওয়া উচিত। এটাই রাষ্ট্রের আদর্শ। এরূপ রাজ্য/রাষ্ট্র কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত বা কারও প্রতি ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহার না করে জীবনের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

* * *

কিছু অস্থিরতাও এই জন্য তৈরি হয়। কারণ আমাদের পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় বিশাল ক্ষেত্রকে আমরা কেবল একটা শব্দতে প্রকট করতে চাই— তা হলো 'জোটমুক্ততা' বা 'জোটযুক্ততা'। আমরা ভুলে যাই যে এই শব্দ কেবল এক বিশেষ বিষয়ের বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করে। আমাদের সাধারণীকরণ করা উচিত নয়। আমাদের এও অনুভব করতে হবে যে একমুখী অবস্থার মধ্যে বিশেষ কোনো খেয়ালে বসে থাকা লাভজনক হয় না। সেই সঙ্গে অন্য নীতিসমূহের মতো পররাষ্ট্র নীতিও চরম লক্ষ্য হতে পারে না। তাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলতে হবে।

উপকূল বিষয়ক বিতর্কিত প্রশ্নেরও বিচার হওয়া চাই। কিছু লোক আছেন যারা এই শব্দের অন্ধভক্ত তৈরি হয়েছেন, একটা খুঁটির চারিদিকে পররাষ্ট্র নীতি ঘুরপাক খাচ্ছে। এরকম ব্যাপার চলতে পারে না। জোটমুক্ততার গুরুত্ব কেবল দুটি শক্তিশালী জোটের সম্বন্ধেই ভাবা হয়। কিন্তু গত এক দশকের মধ্যে অনেক শক্তিশালী দেশ তৈরি হয়েছে এবং নতুন জোট তৈরি হয়েছে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৫

গঙ্গা স্বচ্ছ রাখার জন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জলসম্পদ, নদী বিকাশ এবং গঙ্গা সংরক্ষণ মন্ত্রী উমা ভারতী গত ২০ আগস্ট প্রয়াগের চন্দ্রশেখর আজাদ পার্কে ১৬৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের স্বচ্ছ গঙ্গা ও প্রকাশ্য শৌচমুক্ত ভারত গঠনের জন্য শপথবাক্য পাঠ করান। গঙ্গাবিধৌত ৫ রাজ্যের ৫২টি জনপদের গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উমা ভারতী পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেন, গঙ্গা ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখা দেশের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব।

আপনাদের শপথ গ্রহণের ফলে স্বচ্ছ গঙ্গা ও প্রকাশ্য শৌচমুক্ত ভারত নির্মাণের জন্য দেশবাসী প্রেরণা পাবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, সারা দেশে সব নদীবিধৌত এলাকায় স্বচ্ছ পরিবেশের জন্য এরকম প্রয়াস চালানো হবে।

সন্ত্রাস নির্মূল করতে সিরিয়া ভারতের সাহায্যপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এতকাল ভারতে সন্ত্রাস নিয়ে হৈচৈ হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ২০১৪ সালে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। সম্প্রতি সিরিয়া এই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হলো। অতঃপর দুই দেশ ইসলামিক স্টেট সহ প্রত্যেকটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করবে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক আলোচনাচক্রে সে দেশে সফররত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এম জে আকবর জানান সন্ত্রাসদীর্ণ সিরিয়ার পুনর্নির্মাণে ভারত সক্রিয় অংশ নিতে চায়। প্রেসিডেন্ট আসাদ তাঁর দেশের পক্ষ থেকে ভারতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আমরা সিরিয়াকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই। এ ব্যাপারে ভারতের কাছে সিরিয়া সাহায্যপ্রার্থী।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস নির্মূল করার প্রশ্নে সিরিয়া ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি কয়েকজন যুবক ভারত থেকে পালিয়ে সিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছে। ভারত তাদের সম্পর্কে পুরো তথ্য চায়। এ ব্যাপারে ভারতকে সম্পূর্ণ সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট।

বিজ্ঞাপন নিয়ামক সংস্থার বিরুদ্ধে বাবা রামদেবের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের বিজ্ঞাপন নিয়ামক সংস্থার বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে বাবা রামদেব প্রতিবাদে সরব হলেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী, তিনি খুব শীগগির ভারতের বিজ্ঞাপন নিয়ামক সংস্থা অ্যাডভারটাইজিং কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এ এস সি আই)-র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে চলেছেন। তাঁর অভিযোগ, নিয়ামক সংস্থাটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাবা রামদেবের কোম্পানি পতঞ্জলিকে লোকসমক্ষে হেয় করছে এবং কয়েকটি বিদেশি বহুজাতিকের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাজ করছে। কয়েকদিন আগে নিয়ামক সংস্থার পক্ষে পতঞ্জলির বিজ্ঞাপনে অন্যান্য কোম্পানির তৈরি জিনিস অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে ছোট করে দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাবা রামদেবের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বাবা রামদেব বলেন, 'ওরা আমায় ২৭টা নোটিস পাঠিয়েছে। আমার প্রশ্ন, বিদেশি বহুজাতিকগুলির বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন নিয়ে ওরা কিছু বলছে না কেন? একটি কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে ওদের ক্রিম মাখলে ৭ দিনে ফরসা হওয়া যায়। এটা সম্ভব?' তিনি জানান, এক সময় যাঁরা টুথপেস্টে চারকোল, নুন ও নিমের ব্যবহার নিয়ে নাক সিঁটকাতো এখন তারাই প্রশংসা করছে। তাঁর মতে, দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের সমর্থনে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবার এগিয়ে আসা উচিত।

পিভি সিন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পিভি সিন্ধুর আগে ভারতের আর কোনো মহিলা ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে রুপোর পদক জেতেননি। মাত্র ২১ বছর বয়েসে এই অনন্য কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন। পরিসংখ্যানবিদরা জানাচ্ছেন সেটাও একটা রেকর্ড। এর আগে ২০১২ অলিম্পিকে সাইনা নেহাওয়াল ২২ বছর বয়েসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল পর্যায়ে সিন্ধুই প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় যিনি প্রতিপক্ষকে সরাসরি হারাতে পেরেছেন। অন্যদিকে, সিন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যারোলিনা মেরিন প্রথম ইউরোপীয় মহিলা হিসেবে ব্যাডমিন্টনে স্বর্ণপদক জিতলেন। এর আগে যারা জিতেছেন তারা সকলেই এশীয়।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - সমুদ্ভাষিত অনুত্তম
সুমিত্রা ঘোষ - শিরিণ
জিষ্ণু বসু - আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি

প্রবন্ধ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়, অমলেশ মিশ্র, ড. তুষারকন্তি ঘোষ, রবিরঞ্জন সেন, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ।

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, এষা দে, প্রবাল চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক - চীনের চাউমিন আমাদের চাউমিন

ভ্রমণ কথা

কুণাল চট্টোপাধ্যায় — চীন থেকে ফিরে

ইতিহাস

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য— তালকাড

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিশ্বশ্রীর মন্দিরে বেহাল দশা

নবাঙ্কুর (ছোটদের বিভাগ)

সিদ্ধার্থ সিংহ, বিরাজ নারায়ণ রায়, শান্তনু গুড়িয়া

সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
29 August - 2016 - Rs. 10.00,